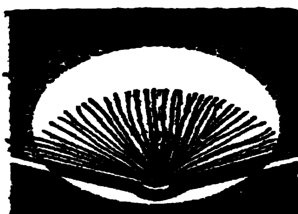
রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র

পুলকেশ দে সরকার



আলোকতীর্থ

১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীগোপীনাথ মুখোপাধ্যায়
১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
শ্রীঅরুণ গুপ্ত

ব্লক ঃ
স্ট্যান্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
কলকাতা-৯

মুদ্রক ঃ
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চৌধুরী
লোকসেবক প্রেস
৮৬-এ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলকাতা-১৪

উৎসর্গ

আমার অশেষ শ্রদ্ধাভাজন শ্রীশৈবালকুমার গুপ্তকে

জীবনারম্ভে দুটি অসাধারণ চরিত্র আমাকে মুগ্ধ করেছিল—বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ। এ দুটি চরিত্রের অন্ত পাইনি, নাগাল পাইনি। স্বপ্ন দেখেছিলাম, এই দুই জ্যোতিষ্কের কণামাত্র আলোর স্পর্শও যদি হৃদয়ে লাগে উজ্জ্বল হতে পারব। কিন্তু সেই তেজ সেই বীর্য সেই অনন্য নিষ্ঠা, মেধা, হৃদয়বত্তা, স্নেহ, মমতা, জীবন ও শিল্পবোধ এমনই অসামান্য যে, তার তিলমাত্রও আত্মস্থ করব কি উপলব্ধিই করতে পারিনি। তাই খুঁজে ফিরেছি সততায় ঋজু বলিষ্ঠ মানুষ সারাটা জীবন। নিজের অসার্থকতার ভারে আনত হয়েছি তাঁদের কাছেই যাঁদের মধ্যে দেখেছি ঐ দুই মহাপুরুষের লেশমাত্রও পূতচিহ্ন। আপনার মধ্যে এমনই একটি প্রতিবিম্বিত সত্তা লক্ষ্য করেছি। আমার এই বইখানি নিঃসঙ্কোচে তাই আপনাকে উৎসর্গ করলাম। আপনার নৈতিক দৃঢ়তা, শ্রমসাধ্য কর্মপটুতা, প্রতিবন্ধকতার মুখে অনমনীয় বলিষ্ঠতা, অন্যায়ে ক্ষোভ ও দুঃখমোচনে বিনম্র নিরলস চেষ্টা আমাকে প্রণত করেছে।

বইটি এমন কিছু নয়। শরৎচন্দ্রের বিচিত্র নারীচরিত্রের মূল সূত্র কি তারই অনুসন্ধানে যে বিরাট কর্মভার আমি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছি তারই দুটি 'উপজাতে'র এই একটি। শরৎচন্দ্রের একটা রাজনৈতিক দিক ছিল—সেটি ধরতে চেষ্টা করেছি শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক ভাবনায়; শরৎচন্দ্রের শিল্পীজীবনে আরও একটা দিক ছিল, তা হচ্ছে আমাদের বঙ্গসাহিত্যের বিচিত্রগামী শিল্পপ্রতিভা এবং সুরুচি ও সৌন্দর্যের প্রতীক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। সর্বব্যাপী সূর্যের অস্তিত্ব সত্ত্বেও তমোনাশা স্নিগ্ধ চন্দ্রোদয় ও তার অম্লান জ্যোতিবিকীরণ বাংলা সাহিত্যের এক দুর্জ্ঞেয় গৌরব। এই রবি ও শশীর মধ্যে কি সম্বন্ধ বিরাজিত ছিল? এই বইখানি সেই জিজ্ঞাসার ফল।

আপনি আমাকে স্নেহ করেন: ত্রুটি ও অসংলগ্নতা সত্ত্বেও এই চেষ্টাকে সস্নেহে গ্রহণ করবেন ভরসাতেই এটি আপনাকে নিবেদন করলাম। বলাবাহুল্য এতে আপনি কোন পাণ্ডিত্য প্রত্যাশা করবেন না। স্কুল-জীবনেই বাঙলার বিপ্লব সাধনায় আত্মনিমগ্ন কিছু মানুষের সংস্পর্শে জড়িয়ে পড়েছিলাম; সেই সূত্রে আপন আবেগে ছন্নছাড়া ও বন্দীজীবন যাপন করেছি যৌবনের উৎকৃষ্টকালভরে। সাংবাদিকতাকে দেশসেবা গণ্য করে যেদিন এই

আসরে প্রবেশপত্র পেলাম সেদিনও মানুষ খোঁজা আমার শেষ হয়নি। সাহিত্যাঙ্গনে এসেছি কুণ্ঠিত পদে, কোন স্রোতের সঙ্গেই যেন গা ভাসিয়ে দিতে পারিনি। এই তিনটি ক্ষেত্রে মানুষের দেখা একেবারে পাইনি এমন কথা বললে আমার দৈন্য ও কার্পণ্যই বড় হয়ে ওঠে। অনেকের দেখা পেয়েছি। কিন্তু বিদ্যাসাগর বিবেকানন্দ যেখানে পূর্ণাঙ্গ সেখানে তুলনীয় বস্তু সহজলভ্য নয়। সাহিত্যক্ষেত্রে আমাকে অনেকে নাড়া দিয়েছেন ঃ নিঃসন্দেহে তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল, দীনবন্ধু হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বীরবল, নলিনীকান্ত, রামেন্দ্রসুন্দর এবং শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যো, শৈলজারঞ্জন, প্রবোধ সান্যাল, নারায়ণ গাঙ্গুলী এবং আরও অনেকে। কালে, বয়স ও কীর্তিতে তাঁদের সঙ্গে আমার সর্বদাই একটা দূরত্ব থেকে গেছে; এই দূরত্ব থেকেই আমার বুদ্ধি ও সাধ্যমত কীর্তিমানদের মূল্যায়ন সুরু করেছি। 'রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র' সেই আরম্ভের একটা দিক।

ইতি বিনীত

পুলকেশ দে সরকার

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র

১

চন্দ্রোদয়

রেঙ্গুন যাবার আগে (১৯০৩) অবহেলায় ফেলে-যাওয়া লেখাগুলোর একটি—'বড়দিদি'—সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে সরলা দেবী সম্পাদিত 'ভারতী'-তে বেরোলে রবীন্দ্রনাথ পড়ে বলেছিলেন, 'যেমন ক'রে পারো, তাঁকে আনাও, সৌরীন, তাঁকে ধরে এনে লেখাও! বাঙলাদেশে এঁর জোড়া লেখক পাবে না।' কবির প্রত্যাশা পূরণ হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মনোভাব আগাগোড়া অনুরাগে সিক্ত থাকলেও মাঝে মাঝে বিরোধ ও অভিমান-ক্লিষ্টও হয়েছে। এই বিরোধ ও অভিমান চারটি উপলক্ষে সরবে উচ্চারিত। একবার যখন রবীন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলনের নিষ্ফলতার প্রতি অঙ্গুলি-সঙ্কেত ক'রে শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত রাখবার আবেদন জানিয়েছিলেন তাঁর শিক্ষার মিলন'-এ তখন অসহযোগী দেশবন্ধুর সহচর শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন 'শিক্ষার বিরোধ'। দ্বিতীয়বার, যখন 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্যের সমালোচনা করেছিলেন। তৃতীয়বার, যখন শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' বৃটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করলে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে প্রতিবাদ জানাবার অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রাজি হন নি। আর একবার সাহিত্যে রীতি নীতি নিয়ে। এ চারটি ক্ষেত্র ছাড়া কখনো-সখনো দুটি-একটি বিরূপ মন্তব্য বা ইঙ্গিত বাদ দিলে শরৎচন্দ্র নিঃসংশয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, ওঁর কথামতো 'ভক্ত'ই ছিলেন। শরৎচন্দ্র ১৯৩১-এ রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে বলেছিলেন, 'আর কোথাও না হোক্, সাহিত্যে গুরুবাদ আমি মানি।'

১৯১২ খৃষ্টাব্দে বা ১৩১৯ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ব্রহ্মদেশে থাকতে শ্রীমতী অনিলা দেবী ওরফে শরৎচন্দ্র যখন 'নারীর লেখা' লেখেন তখন তাতে এই কথাটুকু ছিল: "রবিবাবুর লেখা খুব ভাল। তাঁকে নকল করার ইচ্ছাও স্বাভাবিক, এবং করিবার চেষ্টাও সাধু। কিন্তু, একেবারে রবিবাবুই হইব এমন পণ করিতে গেলে চলিবে কেন? দেখিতে পাওয়া উচিত যে, তোমার গায়ে তাঁর সাড়ে দশ-গজি গাউন সার্কাসের ঐ কাহাদের মতই মানাইয়াছে। তাঁর লেখার দোষই বল, আর গুণই বল, পড়িলেই হয় এত বধ্

সোজা। লিখিলে আমিও এমন পারি। তাঁর উপমাগুলা এতই স্বাভাবিক এবং সরল যে, দেখিবামাত্রই মনে হয়—বাঃ—এ ত আমিও জানি—উপমা দিবার প্রয়োজন হইলে ঠিক এইটি ত আমিও দিতাম। কিন্তু ভ্রান্ত অনুকরণ-প্রয়াসীরা ভাবিয়াও দেখে না যে, কোহিনূরের নকল হয় না—টেটের তারমণ্ড হয়।...

"রবিবাবু কতগুলো শব্দ প্রায়ই ব্যবহার করেন। সেইগুলা এবং তাঁহার উপমা ও লিখিবার প্রণালী আজ-কালকার সাহিত্যসেবী নরনারীরা কিরূপে যে বিকৃত করিতেছেন তাহা দেখিলে ক্লেশ বোধ হয়। তিনি যাঁহাদের গুরু তাঁহাদের উচিত তাঁকে বুঝিবার চেষ্টা করা, তাঁকে শ্রদ্ধা করা! ভিতরে ভিতরে ইঁহারা শ্রদ্ধা করেন কিনা, এ-কথা অবশ্য বলিতে পারি না, কিন্তু বাহিরে ভ্যাঙচানির চোটে গুরুজীর হাড় পর্য্যন্ত যে কালি হইবার উপক্রম হইয়াছে, সে-কথা বাজি রাখিয়া বলিতে পারি।" (১)

যেহেতু লেখাটি অনিলা দেবীর ওরফে এজন্য তিনি বলেছেন, তিনি পুরুষদের কথা বলছেন না; ব'লে কয়েকজন নারী-লেখকের নামোল্লেখ করেছেন। তাঁদের কিছু কিছু লেখা থেকে নানা দৃষ্টান্তযোগে বলেছেন, "রবিবাবুর সত্য অনুকরণ যতই কঠিন হউক, বিকৃত করা খুব সহজ।" রবীন্দ্রনাথ যেসব শব্দ সচরাচর ব্যবহার করেন তাদের তিনি একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রসঙ্গত দিয়েছেন, উদ্দেশ্য, অনুকরণকারীদের এই শব্দগুলোর অপব্যবহার দেখানো। কিন্তু এতে, শরৎচন্দ্র রবীন্দ্র-রচনা কি-রকম একাগ্রতার সঙ্গে পড়েছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথার্থ শব্দপ্রয়োগে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর লেখকেরা সবিশেষ। উপযুক্ত শব্দ ও বিশেষণ প্রয়োগের জন্যই তাঁরা প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন; শরৎচন্দ্রও তাঁদেরই একজন। শরৎচন্দ্রের বিশেষণ প্রয়োগ অপূর্ব এবং নিজস্ব।

রেঙ্গুনে রবীন্দ্র সম্বর্ধনা

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ জাপান হ'য়ে আমেরিকা যাত্রাপথে রেঙ্গুনে এসে ৮ই মে স্থানীয় জুবিলী হলে তাঁকে যে সম্বর্ধনা জানানো হয়, তার মানপত্র শরৎচন্দ্রেরই লেখা; পড়েছেন কবি নবীনচন্দ্র সেনের পুত্র নির্মলচন্দ্র সেন; শরৎচন্দ্র নিজেও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শরৎ-সাহিত্য-

(১) শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ, ৭ম সম্ভার, পৃঃ ৩৭৫।

সংগ্রহের-দ্বাদশ সম্ভারে ৩৩০ পৃষ্ঠায় ফুটনোটে দেওয়া এই সংবাদের মধ্যে এই উপলক্ষে রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রে পরিচয় হয়েছিল কিনা সে খবর নেই। সংবাদটি গিরীন্দ্রনাথ সরকার রচিত 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' (পৃঃ ২২২-৩৩) থেকে আহৃত। সম্বর্ধনাপত্রের তারিখ, ২৫-এ বৈশাখ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ। রবীন্দ্র জন্মদিন। সম্বোধন ছিল এইভাবে : "জগৎবরেণ্য—শ্রীযুক্ত সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাইট, ডি, লিট,. মহোদয় করকমলেষু—কবিবর, এই সুদূর সমুদ্রপারে বঙ্গমাতার ক্রোড়বিচ্যুত সন্তান আমরা আজ হৃদয়ের গভীরতম শ্রদ্ধা ও আনন্দের অর্ঘ্য লইয়া, আমাদের স্বদেশের প্রিয়তম কবি, জগতের ভাব ও জ্ঞান রাজ্যের সম্রাট—আপনাকে অভিবাদন করিতেছি।...

"আপনার কাব্য-বীণায় সহস্র অনির্বচনীয় সুরে ভারতের চিরন্তন বাণী, সত্য শিব সুন্দরের অনাদি-গাথাধ্বনিত হইয়া এক বিশ্বব্যাপী আনন্দ অপরিসীম আশা ও অসীম আশ্বাসে মানব-হৃদয়কে আকুল ও উদ্বেল করিয়াতুলিয়াছে। এই বিশাল সৃষ্টির অনুপরমাণু এক আনন্দে নিত্য পরিস্পন্দিত হইতেছে, এবং এক অপরিচ্ছিন্ন প্রেমসূত্রে যে এই নিখিল জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে, আপনার কাব্যে সেই পরম সত্যের সন্ধান পাইয়াছি, এবং আপনাকে—কোন দেশ বা যুগবিশেষের নয়—সমগ্র বিশ্বের কবি বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি। আপনার কথায়, কাব্যে, নাট্যে ও সঙ্গীতে যে মহান্ আদর্শ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি, এক লোকাতীত রাজ্যের আলো'কে আপনার নয়ন উদ্ভাসিত, এক অমৃত সত্তার আনন্দরসে আপনার হৃদয় অভিষিক্ত।" (২)

কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ্যণীয় যে, অনিলা দেবীর "নারীর লেখায়" রবীন্দ্রানুকরণের দায় সম্পর্কে সতর্কতা সত্ত্বেও এই মানপত্রটি বহুলাংশে রবীন্দ্রভাষায় প্রভাবিত। পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র চন্দননগরে আলাপ সভায় বলেছেন, তাঁর স্মৃতিশক্তি খুবই প্রখর।

দ্বিজেন্দ্রলালের পর কে ?

'ভারতবর্ষ' মাসিকপত্রের প্রথম সংখ্যায় কিছু অংশ সম্পাদনা ক'রে দ্বিজেন্দ্রলাল পরলোকে গেলে প্রথমে হাইকোর্টের জজ সারদাচরণ মিত্রকে 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদক করার কথা হয়, পরে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও জলধর সেনকে যুগ্ম সম্পাদক করা হয়। 'ভারতবর্ষে'র লেখক শরৎচন্দ্র

(২) শরৎ-সাঃ সংগ্রহ, ১২ সম্ভার, পৃঃ ৩২৯

রেঙ্গুনে থাকতে এই সংবাদ পান, এবং ৩১-এ মে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে দ্বিজেন্দ্রলালের জন্য হায় আফশোষ ও তাঁর সর্বমুখীন যোগ্যতার ভূয়সী প্রশংসা ক'রে লেখেন, "দ্বিজুবাবুর মৃত্যুর পর রবিবাবু ছাড়া এত বড়কাগজ—এত বেশী আয়োজন, এত বেশী subscription—আর কেউ চালাতে পারবে না।" (৩) আরও বলেছেন, "দ্বিজুবাবু যেমন প্রবন্ধে, গল্পে, নাটকে সমালোচনায় একাই কাগজ ভরিয়ে দিতে পারতেন, রবিবাবুও তাই পারেন। নতুবা হরিদাসবাবুর বোধ করি বন্ধ ক'রে দেওয়া উচিত।" ঐ প্রমথবাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের বন্ধু। তাঁকে আর একখানি চিঠিতে এই ১৯১৩ খৃষ্টাব্দেই ১২ই মে তাঁর 'চরিত্রহীন প্রকাশ নিয়ে যখন ভারতবর্ষের দ্বিধাদ্বন্দ্ব চলছিল তখন শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, "আমার মনে আছে, বঙ্গদর্শনে যখন রবিবাবুর 'চোখের বালি' আর 'নৌকাডুবি' বার হয় লোকে যেন বঙ্গদর্শনের আশায় পথ চেয়ে বসে থাকত। আসা মাত্র কাড়াকাড়ি পড়ে যেত।" (৪) ঐ প্রসঙ্গেই আবার এক চিঠিতে বলেছেন, "অথচ রবিবাবুর 'চোখের বালি' ভদ্রঘরের বিধবা, নিজের ঘরের মধ্যে, এমন কি আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে নষ্ট হইতেছে—কেহ কথাটি বলে নাই। (৫)

ব্রহ্মদেশে থাকতে শরৎচন্দ্রের রবীন্দ্রানুরাগের একটি দৃষ্টান্ত সন্নিবেশ করেছেন নরেন্দ্র দেব তাঁর 'সাহিত্যাচার্য-শরৎচন্দ্র'-এ। 'বেঙ্গল সোস্যাল ক্লাব' নামে রেঙ্গুন প্রবাসী বাঙালীদের একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। সেইখানে প্রতি সন্ধ্যায় সকলেই সমবেত হয়ে সংগীত, সাহিত্য, নাট্যকলা, আবৃত্তি, অধ্যয়ন ও খেলাধূলায় অবসর যাপন করতেন।...যেদিন থেকে শরৎচন্দ্রের মধুর কণ্ঠের সুস্বর লহরী কানে এল, হিন্দুস্থানী গাইয়েদের বর্জন করলেন তাঁরা। এরপর সেখানে প্রত্যেক গানের আসরে একমাত্র প্রধান গায়ক হলেন—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র।

"তিনি সে আসরে রবীন্দ্রনাথের রচিত নব নব সংগীত একমাত্র কবিরই অন্তর-ছোঁয়া সুরে গান করতেন।" (পৃঃ ৪৯-৫০)

রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের "উচ্ছৃঙ্খল জীবনের প্রধান সঙ্গী ছিলেন...বঙ্গচন্দ্র দে... পূর্ববঙ্গনিবাসী উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক...দার্শনিক পণ্ডিত।...বঙ্গচন্দ্র ছিলেন কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের একান্ত অনুরাগী ভক্ত।...শরৎচন্দ্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ ভক্ত। বঙ্গচন্দ্র তাঁর এই দুর্বলতার কথা জানতেন, তাই

(৩) শঃ সাঃ সঃ, ১৩ সম্ভার, পৃঃ ৩৯২
(৪) শঃ সাঃ সঃ, ১৩ সম্ভার, পৃঃ ৩৮৭
(৫) শঃ সাঃ সঃ, ১৩ সম্ভার, পৃঃ ৪০৬

শরৎচন্দ্র যখন নবীনচন্দ্রের রচনা নিয়ে 'তোদের বাঁশীমোহন কবি তো এই লেখে'—বলে' বিদ্রূপ ও উপহাস করতেন, বঙ্গচন্দ্র তখন স্বর্গীয় কাব্যবিশারদের বুলি আউড়ে বলতেন—'থাম্ থাম্—তোদের পায়রা কবির বক্‌বকানি আর শুনতে পারিনি!' শরৎচন্দ্র তখন আর তর্ক না করে রবীন্দ্রনাথের গান ধরতেন—

'তোমার কথা হেথা কেহ ত বলে না,
করে শুধু মিছে কোলাহল।
সুধা-সাগরের তীরেতে বসিয়া
পান করে শুধু হলাহল।' "(পৃপৃঃ ৫১-৫২)

রেঙ্গুন থেকে স্বদেশে ফিরে হাওড়ার বাজে শিবপুরে ৬ নং নীলকমল কুণ্ডু লেনে থাকতে 'চার ইয়ারি'র প্রখ্যাত প্রমথ চৌধুরিকে ১৯১৬ খৃস্টাব্দে ২১-এ সেপ্টেম্বর একখানি চিঠিতে 'সোমনাথের গল্পটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। চিঠিটির ফুটনোটে লিখেছেন: "সেদিন এই বইয়ের প্রসঙ্গে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি আমাকে বলেছিলেন, আপনি রবিবাবুর সব কবিতার মানে বুঝিয়ে দিতে পারেন? আমি বলি, না, পারি না। তার কারণ, আপনি বেদান্তে-পড়া পণ্ডিত হ'লেও কাব্য বোঝবার পণ্ডিত নন। তা ছাড়া, সব কবিতার মানে সবাইকে যে বুঝতেই হবে এমন কিছু মাথার দিব্যি দেওয়াও নেই। রবিবাবুর 'শ্রেষ্ঠভিক্ষা' পড়ে গুরুদাস বাবু বলেছিলেন, এমন অশ্লীল বস্তু ইতি-পূর্বে তিনি দেখেন নাই। সুতরাং কথাটা স্যার গুরুদাসের মুখ থেকে বার হয়েছে বলেই মেনে নিতে হবে এবং না নিলে মারাত্মক অপরাধ হবে তাও নয়।" ফুটনোটের তারিখটা ২।১০।১৬ অর্থাৎ দিন এগারো পর। (৬) এখানেও শরৎচন্দ্রের রবীন্দ্র কাব্যের প্রতি অনুরাগ নিঃশর্ত।

যোগাযোগ

এরপর দেখছি, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের একটা যোগাযোগের উপলক্ষ আসন্ন হয়ে আসছে। "সেবক" শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে বাজে শিবপুর থেকে ১৩২৪ বঙ্গাব্দের ২৯ পৌষ (অর্থাৎ জানুয়ারি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে) লিখেছেন: "শ্রীচরণেষু,—আজ আমরা আপনার কাছে যাইতেছিলাম। কিন্তু, পথে শ্রীযুক্ত প্রমথ বাবুর (প্রমথ

(৬) শঃ সাঃ সঃ, ১৩সঃ, পৃঃ ৪২৫

চৌধুরী) কাছে টেলিফো করিয়া শুনিলাম আপনি বোলপুরে। মাঘোৎ-সবের সময় হয়ত আসিবেন, কিন্তু, দেখা করা শক্ত।

"আমাদের পাড়ায় একটি ছোটখাটো সাহিত্যসভা আছে। দু'এক মাস অন্তর কাহারো বাটীতে তাহার অধিবেশন হয়। নিতান্তই নগণ্য ক্ষুদ্র ব্যাপার। তবুও গতবারে আমরা প্রমথবাবুকে ধরিয়াছিলাম, তিনি দয়া করিয়া সভাপতি হইয়াছিলেন। কয়েকদিন হইতে আমরা ক্রমাগত তর্কাতর্কি করিয়াও মীমাংসা করিতে পারিতেছি না, এ সভায় আপনার পায়ের ধূলা পড়ার কিছুমাত্র সম্ভাবনা আছে কিনা। একার যখন বাড়ী আসিবেন, যদি অনুমতি দেন, আমরা গিয়া আপনার কাছে আবেদন করি।" (৭)

জালিনওয়ালাবাগের জ্বালা

এরপর সারা ভারতবর্ষে যে একটা রাজনৈতিক ভূমিকম্প হ'ল তার এপিসেণ্টারটা ছিল সুদূর পাঞ্জাবের জালিনওয়ালাবাগে। কিন্তু সে দুঃখ ও বেদনা, রাগ ও অভিমান কেউ প্রকাশ করতে পারেন নি এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া। পাঞ্জাব থেকে বাঙলা কত দূর—। কিন্তু শাসককূলের ইচ্ছাকৃত সে নির্বিচার হত্যালীলা কবির প্রশান্ত হৃদয়কে উদ্বেলিত করেছিল। একমাত্র তিনিই সেদিন ইংরাজের দেওয়া খেতাব স্যার উপাধি বা নাইটহুড প্রত্যর্পণ করতে গিয়ে বড়লাটকে যে চিঠি লিখেছিলেন তা আহত কিন্তু প্রতিকার-নিরুপায় ভারতবর্ষেরই মর্মবাণী। শরৎচন্দ্র হাওড়া-বাজে শিবপুর থেকে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৬ আগষ্ট শ্রীঅমল হোমকে লিখেছিলেনঃ "অমল, 'ভারতী'র আড্ডায় সেদিন শুনলাম তোমারও নাকি খুব ফাঁড়া গিয়েছে [অমল হোম লাহোরের 'দৈনিক ট্রিবিউনে'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন]। ইংরেজের মারমূর্তি খুব কাছে থেকেই দেখে নিলে।...ওরা যে কত নিষ্ঠুর কতটা পশু হতে পারে, তা ইতিহাসের পাতাতেই ছিল এতদিন—এবার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হ'ল। আর এক লাভ—দেশের বেদনার মধ্যে আমরা যেন নতুন ক'রে পেলাম রবিবাবুকে। এবার একা তিনিই আমাদের মুখ রেখে-ছেন। 'নারায়ণে'র সময় সি আর দাশ একদিন আমাকে বলেছিলেন যে, রবিবাবু যখন নাইটহুড নেন, তখন নাকি দাশ সাহেব কেঁদেছিলেন। এখন একবার তাঁর দেখা পেলে জিজ্ঞাসা করতাম, আজ আমাদের বুক দশ হাত কিনা বলুন।"(৮) সি আর দাশের সঙ্গে দেখা একবার নয় অনেকবারই

(৭) শঃ সাঃ সঃ, ১৩ সঃ পৃঃ ৪৪৯
(৮) শঃ সাঃ সঃ, ১৩ সঃ পৃঃ ৪৪০-৪১

হয়েছে, তাঁকে শরৎচন্দ্র একথা কখনো বলেছিলেন কিনা জানা যায় না। ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়, এত আনন্দ সত্ত্বেও তিনি কবির কাছে গিয়ে তাঁর এই অসাধ্য সাধনে নিজের ও দেশের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন নি ; চিঠিও লেখেন নি অথচ মৃত্যুশয্যায় শায়িত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কবিকে অনুরোধ জানিয়ে স্বগৃহে আনিয়ে তাঁর পায়ের ধূলা নিয়েছেন। তার পরই তাঁর জীবন-দীপ নিভে যায়।

মিলন ও বিরোধ

পক্ষান্তরে, দু বছরের মধ্যেই ১৯২১-এ, এই দুজনেব মাঝখানে অতি মৌলিক এক বিরোধের ছায়াপাত ঘটে। সি আর দাশ-সম্পাদিত 'নারায়ণ' মাসিক পত্রে শরৎচন্দ্রের 'স্বামী' গল্পটির প্রকাশসূত্রে দাশসাহেব ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে গভীর হৃদ্যতার সঞ্চার হয় এবং তা অতি দ্রুত এমনই নিবিড় হয় যে, শরৎচন্দ্র সি আর দাশের আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন ও তাঁর নির্দেশে হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট হন ; তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক ও নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্যও হয়েছিলেন। কিন্তু বিদেশে থাকতেই ববীন্দ্রনাথ এই অসহযোগ আন্দোলনকে অনুকূল দৃষ্টিতে দেখতে পারছিলেন না ; শিক্ষাক্ষেত্রে এই অসহযোগকে সমূহ সর্বনাশ ব'লে গণ্য করছিলেন ; চরকার সঙ্গে স্বরাজের বন্ধনকে স্বীকার করেন নি, বরং ওকে ছেলেমানুষ আখ্যাই দিয়েছেন। বিরোধ প্রবলতররূপে প্রকাশ পায় যখন রবীন্দ্র-নাথ দেশে ফিরে প্রকাশ্য সভায় 'শিক্ষার মিলন' (৯) প্রবন্ধ পাঠের মধ্য দিয়ে অসহযোগিতার ক্ষতি ও নিষ্ফলতা বিশেষ জোর দিয়েই বলেন। শরৎচন্দ্র এর পাল্টা জবাবে বা প্রতিবাদে যা লেখেন তার শিরোনামা হয় 'শিক্ষার বিরোধ'। (১০)

দুটি প্রবন্ধই এত বড় এবং এত নিবিড়ভাবে পড়া দবকার যে, বিক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিতে ভুল বোঝবার অবকাশ ঘটতে পারে। শরৎচন্দ্র কবিকে "গুরুতুল্য পূজনীয়" বলে প্রতিটি কথারই বিপরীত কথা বলেছেন ; এখানে মাত্র কয়েকটি নিদর্শন তুলছি উভয়ের ভাবনার পার্থক্য দেখাতে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "আজকের দিনের পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েছে।...নিশ্চয় সে কোন একটা সত্যের জোরে।" (১১)

---

(৯) রবীন্দ্র রচনাবলী, ১১ খণ্ড, পৃঃ ৬৬৪

(১০) শঃ সাঃ সং, ১০সঃ, পৃঃ ৩৮০

(১১) রঃ রঃ, ১১খ, পৃপৃঃ ৬৬৪-৫

শরৎচন্দ্র বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথ আমার গুরুতুল্য পূজনীয়। সুতরাং মতভেদ থাকলেও প্রকাশ করা কঠিন। কেবলি ভয় হয় পাছে অজ্ঞাতসারে তাঁর সম্মানে কোথাও লেশমাত্র আঘাত ক'রে বসি। কিন্তু এ তো কেবল-মাত্র ব্যক্তিগত মতামতের আলোচনা নয়—যা তাঁরও বহুপূজ্য—সেই দেশের সঙ্গে এ বিজড়িত।.........

"কবি জোর দিয়ে বলেছেন, একথা মানতেই হবে পশ্চিম জয়ী হয়েছে এবং সে শুধু তাদের সত্য বিদ্যার অধিকারে। হয়ত মানতেই হবে তাই। কারণ সম্প্রতি সেইরকমই দেখাচ্ছে। কিন্তু কেবলমাত্র জয় করেছে বলে এই জয় করার বিদ্যাটাও সত্যবিদ্যা, অতএব শেখা চাই-ই একথা কোনমতেই মেনে নেওয়া যায় না।" বলে তিনি গ্রীস, রোম, আফগানিস্থানের দৃষ্টান্ত উল্লেখ ক'রে বলেছেন, "তাদের বিশ্বভাণ্ডার লুটে-নেবার মধ্যে সত্যের জোর নেই, তা সত্য হয়েও থাকেনি।'(১২)

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, পশ্চিমের লোকে যে বিদ্যার জোরে বিশ্ব জয় করেছে, সেই বিদ্যাকে গাল পাড়তে থাকলে দুঃখ কমবে না। কেবল অপরাধ বাড়বে, কেননা, বিদ্যা যে সত্য।"

শরৎচন্দ্র বলেছেন, "আমি কিন্তু এই উক্তিটাকে পুরোপুরি স্বীকার করতে পারিনে।" কারণ, তিনি অদৃষ্ট মানেন। "আমার মনে হয়, প্রত্যেক মানব-জীবনের দুঃখের অধ্যায়েই তার অপরাধ ছাড়াও একটা জিনিস আছে যা তার অদৃষ্ট, যে বস্তু তার দৃষ্টির বাহিরে এবং যার ওপর তার কোন হাত নেই।"

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গত বলেছিলেন, "মনে কর এক বাপের দুই ছেলে"—এক ছেলে বাপের পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে, আর এক ছেলে বাপ কিভাবে মোটর চালায় তাই দেখে। এই ছেলে একদিন মোটর চালিয়ে এল, বাপ প্রসন্ন হলেন। ঐ মোটরে পায়ে-তাকানো ছেলের পাকা ফসলের ক্ষেত লণ্ডভণ্ড করে দিলেও সে বাপের পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল, বললে, আমার আর কিছুতে দরকার নেই। "কেননা ঐ দুরন্ত ছেলের কাছে" বাপের দোহাই পাড়লে মরণং ধ্রুবং"।

শরৎচন্দ্র বলেছেন, "এই গল্পের সার্থকতা কি আমি বুঝতে পারিনি।... এক ছেলের প্রতি আর এক ছেলের অকারণ দৌরাত্ম্য দেখে যে বাপ প্রসন্ন হন, তিনি যে কিরূপ বাপ তা বোঝা যায় না। তবে একথা বোঝা যায়,

(১২) শঃ সাঃ সং. ১০ সঃ পৃঃ ৩১২।

এমন বাপের পায়ের দিকে যে ছেলে তাকিয়ে থাকে, তার 'মরণং ধ্রুবং'।"

শরৎচন্দ্র বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের যে-কথা এতক্ষণ ছিল অস্পষ্ট তা নাকি একেবারে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তখন যখন তিনি বললেন: "পূর্বদেশে আমরা যে সময়ে ভূতের ওঝাকে ডাকছি; দৈন্য বলে গ্রহের শান্তির জন্যে দৈবজ্ঞের দ্বারে দৌড়চ্ছি...ঠিক সেই সময়ে পশ্চিম মহাদেশে ভল্‌টেয়ার্‌কে একজন মেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, শুনেছি নাকি মন্ত্রগুণে পালকে পাল ভেড়া মেরে ফেলা যায়, সে কি সত্য? ভল্‌টেয়ার জবাব দিয়েছিলেন, 'নিশ্চয়ই মেরে ফেলা যায়, কিন্তু তার সঙ্গে যথোচিত পরিমাণে সেঁকো বিষ থাকা চাই'।"

শরৎচন্দ্র বললেন, কবির এ অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহলে বলার কিছু নেই। আমাদের সব মরাই উচিত, এমন কি সেঁকো বিষ খেতেও কারো আপত্তি করা কর্তব্য নয়। কিন্তু এই কি সত্য?...এমনি কথা বলবার লোক এখানে কেউ ছিল না যে বলে, বাপু, ভূতের ওঝা না ডাকিয়ে বৈদ্যের বাড়ি যাও?...ইউরোপের জয়গান করতে আমি নিষেধ করিনে কিংবা যে হাতী পাঁকে পড়ে গেছে তাকে নিয়ে আস্ফালন করবারও আমার রুচি নেই, কিন্তু তাই বলে ভূতের ওঝা ও মারণ-উচাটন মন্ত্র-তন্ত্রের ইঙ্গিতও নির্ব্বিবাদে হজম করতে পারিনে।"

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "সেই জাদুমন্ত্রের সাধনায় মানুষ যে চেস্টা সুরু করেছিল আজ বিজ্ঞানের সাধনায় তার সে চেষ্টার পরিণতি। এই চেষ্টার মূল কথাটা হচ্ছে: মানব না, মান্‌ব। অতএব যারা এই চেষ্টায় সিদ্ধিলাভ করেছে তারাই বাহিরের বিশ্বে প্রভু হয়েছে, দাস নেই।"

শরৎচন্দ্র বলেছেন "কোনও একটা বস্তু কত দিক থেকে যে পরিণত হয়ে ওঠে সে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু এই কি ঠিক যে ইউরোপ তার যাদুবিদ্যার নালা একলাফে ডিঙ্গিয়ে গেল, আর আমরা দেশশুদ্ধ লোক মিলে ঘাড়-মোড় ভেঙে সেই পাঁকেই চিরকাল পুঁতে রইলাম?... জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথার্থ জনক-জননী বিশ্বজগতে কার্যকারণের সত্য ও নিত্য সম্বন্ধের ধারণা কি ওই দুর্ভাগ্য পূর্বদেশে কারও ছিল না?"

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বস্তুর নিয়ম যে শিখেছে শুধু যে বস্তুর বাধা তার কেটেছে তা নয়, বস্তু স্বয়ং তার সহায় হয়েছে—বস্তুবিশ্বের দুর্গম পথে ছুটে চলবার বিদ্যা তার হাতে......; আর পথ হাঁটতে হাঁটতে যাদের বেলা বয়ে যায় তারা গিয়ে দেখে যে তাদের ভাগ্যে হয় অতি সামান্যই বাকি, নয় সমস্তই ফাঁকি।"

শরৎচন্দ্র বলেছেন, "এই তত্ত্ব কি পশ্চিম হতে আমদানি না করতে পারলে আমাদের ভাগ্যে মারণ উচাটন মন্ত্র-তন্ত্রের বেশি আর কিছুই মিলতে পারে না? পশ্চিমের বিদ্যার অনেক গুণ থাকতে পারে। কিন্তু সে যদি আমাদের নিজেদের প্রতি কেবল অনাস্থাই এনে দিয়ে থাকে……, ত' মনে হয়, লুব্ধ-চিত্তে পশ্চিমের শুক্রাচার্য্যের পানে আমাদের না তাকানই ভাল। বস্তুত এই ত নাস্তিকতা।"

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "প্রাচীন জাপান আপন হৃৎপদ্মের মাঝখানে সুন্দরকে পেয়েছিল। তার সমস্ত বেশভূষা কর্ম খেলা, তার বাসা আসবাব, তার শিষ্টাচার, ধর্মানুষ্ঠান, সমস্তই একটি মূল ভাবের দ্বারা অধিকৃত হয়ে সেই এককে সেই সুন্দরকে বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রকাশ করেছে।……আধুনিক জাপানকেও এর পাশাপাশি দেখেছি। সেখানে ভোজপুরি মাল্লাব দল আড্ডা করেছে; তালের যে প্রচণ্ড খচমচ উঠেছে সুন্দরের সঙ্গে তার মিল হল না, পূর্ণিমাকে তা ব্যঙ্গ করতে লাগল।

শরৎচন্দ্র বলেছেন, "পশ্চিমের শুক্রচার্য্যের শিষ্যত্বের জোরেই যদি সে আজ বড় হয়ে থাকে, তবে বড়ত্বটাও মেপে দেখেছি আমরা শুক্রাচার্য্যের মাপকাঠি দিয়ে। কিন্তু মানবত্ব বিকাশের সেই কি মানদণ্ড? জাতীয় জীবনে এই দু'শো পাঁচশো বছরের ঘটনাই কি তার চরম ইতিহাস? আমি জাপানের ইতিহাস জানিনে।…কিন্তু এই তার পার্থিব উন্নতির মূলে, পশ্চিমের সভ্যতার পদতলে যদি তার আত্মসমর্পণের সুচনাই করে থাকে ত তারস্বরে আনন্দধ্বনি করবাব বোধ হয় বেশি কারণ নেই।"

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমি জানি, আজকের দিনে আমাদের দেশে অনেকেই বলে উঠবেন, 'ওই কথাটাই তো আমরা বাববার বলে আসছি। ভেদবুদ্ধিটা যাদের এত উগ্র, বিশ্বটাকে তাল পাকিয়ে এক এক গ্রাসে গেলবার জন্য যাদেব লোভ এত বড় হাঁ করেছে তাদের সঙ্গে আমাদের কোন কারবার চলতে পারে না, কেননা, ওরা আধ্যাত্মিক নয়, আমরা আধ্যাত্মিক…… "

শরৎচন্দ্র বলেছেন, এটা রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মুখে গুঁজে দিয়েছেন। তার পরই বলেছেন, 'এমন কথা যদি কেউ বলেও থাকে ত খুব বেশি অন্যায় করেছে আমার মনে হয় না।'

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এক দিকে এটাও ভেদবুদ্ধির কথা, অপর দিকে এটা সাধারণ বিষয় বুদ্ধির কথাও নয়। মনু বলেছেন—

ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ।

শরৎচন্দ্র বলেছেন, এই যদি ঠিক হয় যে, তারা কেবল অবিদ্যাই মানে এবং আমরা মানি বিদ্যাকে তা হলে ও দুটোর সমন্বয়ের উপায় প্রবন্ধের মধ্যে শ্লোক তুলে তুলে হ'তেও পারে, কিন্তু একটাকে আর একটার না গিলে না খেয়ে বাস্তব জগতে যে কিভাবে সমন্বয় হতে পারে আমি জানিনে। যাদের গেলবার মত বড় হাঁ আছে তারা গিলবেই মনু উপনিষদের দোহাই মানবে না।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমি তো শুনেছি, পশ্চিম দেশ বারম্বার জিজ্ঞাসা করছে, 'ভারতের বাণী কই ?' তারপর সে যখন আধুনিক ভারতের দ্বারে এসে কান পাতে তখন বলে, 'এ তো সব আমারই বাণীর ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, যেন ব্যঙ্গের মত শোনাচ্ছে।'

শরৎচন্দ্র বলেছেন, "প্রথম যুদ্ধটার পর যদি কেউ শোকাকুল চিত্তে প্রশ্ন ক'রে থাকে 'ভারতের বাণী কই', তা হলে সন্দেহ হয় তারা কিঞ্চিৎ রসিকতা করেছে ; এবং এই জন্যেই তাদের নিমন্ত্রণ করে ঘরে ডেকে এনে নিভৃতে 'মা গৃধঃ' মন্ত্র দিয়ে বশ করা যাবে,—এ ভরসা কবির থাকলেও আমার নেই। কারণ, বাঘের কানে 'বিষ্ণু মন্ত্র' ফুঁকলে বৈষ্ণব হয় কিনা আমি ভেবে পাই নে।"

অথচ শরৎচন্দ্র 'মহাত্মাজী' নিবন্ধে বলেছেন, "তাই বোধ হয় সমস্ত ছাড়িয়া মহাত্মাজী রাজশক্তির এই হৃদয় লইয়া পড়িয়াছিলেন।...রাজশক্তির হৃদয় বা আত্মার কোন বালাই না থাকিতে পারে, কিন্তু এই শক্তিকে চালনা যাহারা করে, তাহারাও নিষ্কৃতি পায় নাই।.....ইংরাজ রাজশক্তির প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছেন, কিন্তু মানুষ-ইংরাজদের আত্মোপলব্ধির প্রতি আজও তাঁহার বিশ্বাস তেমনি স্থির হইয়া আছে।" (১৩)

'মা গৃধঃ' কথাটার প্রাসঙ্গিকতা হ'চ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথ ঐ প্রবন্ধেই বলেছেন ঃ "পশ্চিম সভ্যতার অন্তরাসনে লোভ রাজা হয়ে বসেছে, পূর্বেই তার নিন্দা করেছি। কিন্তু নিন্দাটা কিসের ? ঈশোপনিষদে তত্ত্বস্বরূপে এরই উত্তরটি দেওয়া হয়েছে। ঋষি বলেছেন, 'মা গৃধঃ।'

এমনি আরও অনেক। কিন্তু আজ এই দূরপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সুস্পষ্ট দেখছি, শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর অতুল প্রভাবে পড়ে স্বকীয়তা না হারালে অমন দুর্বল

(১৩) শঃ সাঃ সঃ, ২০সঃ, পৃঃ ৩৩৭-৩৮

যুক্তিতে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে খণ্ডন করতে যেতেন না। কেননা, এর পর খুব বেশি দিন অতীত হয়নি, দেশবন্ধুর প্রয়াণের পর সেই মোহমুক্তির বিভিন্ন পর্যায়ে ও পরিশেষে শরৎচন্দ্র নিজের দেওয়া যুক্তিগুলোই খণ্ডন করেছেন। সেকালে শরৎচন্দ্রের এই বিরোধ অন্ততঃ বাঙলাদেশের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হয়নি। শরৎচন্দ্র শেষ পর্যন্ত 'মহাত্মাজী' সম্পর্কেও বিশ্বাস হারিয়েছিলেন, পরবর্তীকালের 'তরুণের বিদ্রোহ' তার সাক্ষ্য। পক্ষান্তরে, গভীর মত-পার্থক্য সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের মহাত্মাজীর প্রতি দীর্ঘতরকাল অবধি শ্রদ্ধা ছিল অটুট।

সর্বদেশে পূজিত কবিবর

১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি বা ১৩২৯ বঙ্গাব্দে "University Institute-এ ছেলেদের মধ্যে কবিতা আবৃত্তির প্রতিযোগিতা ছিল," শরৎচন্দ্র লিখেছেন : সর্ব্বদেশে পূজিত কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'এবার ফিরাও মোরে' শীর্ষক কবিতাটি নির্বাচিত করা হইয়াছিল। যাহারা পরীক্ষা দিবে তাহাদেরই একজন আমার কাছে দুই একটা কথা জানিয়া লইতে আসিয়াছিল। তাহারই কাছে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম যে, এই কবিতাটির যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ—এই দুর্ভাগা দেশের দুর্দ্দশার কাহিনী যেথায় বিবৃত—সেই অংশগুলিই বাছিয়া বাছিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে।" কারণ? কর্ত্তৃপক্ষের মত ও সিডিশন। শরৎচন্দ্র এর ওপর মন্তব্য করেছেন : দেশের যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, যিনি নিষ্পাপ, নির্মল—স্বদেশের হিতার্থে যে কবিতা তাঁহার অন্তর হইতে উত্থিত হইয়াছে, প্রকাশ্য সভায় তার আবৃত্তি 'সিডিশন'—তাহা অপরাধের! এবং এই সত্য দেশের ছেলেরা আজ কর্ত্তৃপক্ষের কাছে শিক্ষা করিতে বাধ্য হইতেছে। এবং কর্ত্তৃপক্ষের অকাট্য যুক্তি এই যে,—ফ্যাসাদ বাধিতে পারে।"(১৪)

সবিনয় নিবেদন

কি একটা মনোমালিন্যসূত্রে এই বছরই রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের পরদিন ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ২৬-এ বৈশাখ অর্থাৎ ১৯২২-এর ৮ই কি ৯ই র পর ১০ই মে নাগাদ শরৎচন্দ্র বাজে শিবপুর, হাওড়া, থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন :

"শ্রীচরণেষু,—ছেলেদের মুখে মুখে শুনিতে পাইয়াছিলাম যে, আপনি আমার প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। উত্তেজনার সময় রাগের মুখে হয়ত

(১৪) শঃ সাঃ সং, ৯ সং, 'সত্য ও মিথ্যা', পৃঃ ৪০৪।

আপনার সম্বন্ধে মিথ্যা কিছু বলিয়া থাকিব, কিন্তু যে ব্যক্তি ইহার সত্যাসত্য আপনার কাছে যাচাই করিতে গিয়াছিলেন তিনিও অপরাধ কম করেন নাই। ইংলণ্ডের ব্যবহারে আপনি ক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং সমস্তই ওই পাঞ্জাব চিঠিখানার জন্য, ওটা না লিখিলে এ সকল কিছুই হইতে পারে না,—এই কথাগুলা আমি যে ঠিক কি ভাবে তখন বলিয়াছিলাম আমার মনে নাই; বানাইয়া মিথ্যা কথা আমি সচরাচর বলি না, কিন্তু বলা একেবারেই যে অসম্ভব তাহাও নয়। অন্ততঃ, এসব নিশ্চয়ই বলিয়াছি যে, এবার বিলাত হইতে ফিরিয়া আপনি অনেক বদলাইয়া গিয়াছেন এবং বাঙলা দেশের লোকের প্রতি আপনার সে স্নেহ মমতা আর নাই। চরকা, নন-কো-অপারেশন প্রভৃতির উপর আপনার কোন আস্থা বা বিশ্বাস নাই' ইত্যাদি ইত্যাদি।

"আপনার নিকট হইতে একদিন আমি রাগ করিয়াই চলিয়া আসিয়াছিলাম। তাহার পরেই হয়ত কতকগুলা মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া থাকিব। হয়ত আমার মনের মধ্যে এই ভাব ছিল যে লোকে ভুল বুঝে ত বুঝুক।

"আপনার কাছে আমি অত্যন্ত অপরাধ করিয়াছি; কিন্তু এই প্রথম বলিয়া আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। আপনি ছাড়া আর কোন বড়লোকের বাড়ীতে আমি ইচ্ছা করিয়া কোনদিন যাই না, আমার সে পথটাও নিজের দোষে বন্ধ হইয়াছে মনে হইলে ভারি দুঃখ হয়।

"আপনার অনেক শিষ্যের মধ্যে আমিও একজন; তাহাদের মত এতকাল আমিও কখনো আপনার নিন্দা করিতে যাই নাই, কিন্তু এবার কেন যে আমার এরূপ দুর্বুদ্ধি হইল জানি না। আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি" (১৫)

রাজনৈতিক গোঁড়ামি ধর্মান্ধতার চাইতে কম মারাত্মক নয়; একবার পেয়ে বসলে মানুষের অসহিষ্ণুতার সীমা থাকে না। ধর্মান্ধের মতই সে পরমতকে শুধু নিন্দাই করে না, ভিন্নমতাবলম্বীকে পেলে খেয়ে ফেলে; নিজেও নিজের গণ্ডীর বাইরে যেতে অসমর্থ হয়, তখন সে মত্ত পশু জ্ঞানহারা হয়। যাকে যা নয় তাই বলে। দৃষ্টান্ত দিতে চাইনে, এমনটি শুধু দলীয় অনুগামীদের ক্ষেত্রেই সত্য নয়, দলীয় নেতাদের মধ্যেও এই সঙ্কীর্ণতা প্রকট। শরৎচন্দ্রের স্বভাবেরও এমনি সাময়িক স্খলন হয়েছিল। কালটা খেয়াল রাখা দরকার। ১৯২২, দেশবন্ধু বেঁচে এবং কবিগুরু কংগ্রেসের সেকালের

(১৫) শঃ সাঃ সঃ, ১৩ পৃঃ ৪০৪, পৃঃ ৪৪৯-৫০

বন্দ্যানীতির সহচর নন, পক্ষান্তরে প্রতিবাদী। রাজনৈতিক দেশবন্ধু-প্রভাবিত সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের তৎকালীন অসঙ্গত আচরণ—যার জন্য তিনি নিজেই লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী—তৎকালোপযোগী, এর বেশি নয়। শরৎচন্দ্রের এই চিঠিখানি তাঁর অকপট মনের দর্পণ, রাজনৈতিক দাম্ভিকদের মত চিরকালের জন্য মুখ ফিরিয়ে বসেন নি।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'শরৎ পরিচয়'-এর পত্রাবলীতে আছে, শরৎচন্দ্র হাওড়া-বাজে শিবপুর থেকে ১২ ভাদ্র ১৩৩০ (আগষ্ট ১৯২৩) শ্রীঅমল হোমকে লেখেন: "আমাকে 'বিসর্জ্জন'টা দেখাও। শুনলাম আবার নাকি হবে। [১৯২৩ এর আগষ্ট মাসের শেষে কলকাতার এম্পায়ার থিয়েটারে (এখন রক্সি সিনেমা) বিশ্বভারতীর সাহায্যকল্পে রবীন্দ্রনাথের বিসর্জ্জন নাটক পর পর তিনদিন অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গ্রহণ করেন জয়সিংহের ভূমিকা।] সেদিন সুধীরের [সুধীর চন্দ্র সরকার] দোকানে গিয়ে ওকে নিয়ে যাওয়া আর হয়ে উঠল না। তোমাদের কাগজে ভুনি বোসের [অমৃত লাল বসুর] প্রশংসাটা পড়ে যেতে না পারার দুঃখটা আরও যেন বেড়ে গেল।

"...অভিনয়টা কিন্তু সত্যিই বুঝি। সখের থিয়েটার অনেক করেছি।... রবিবাবুর অভিনয় দেখিনি কখনো। সুরেশ সমাজপতির কাছে তার গল্প শুনেছিলাম।...একবার যদি তাঁর মুখে সঙ্গীত সমাজে রবি বাবুর বিসর্জ্জন অভিনয়ের প্রশংসা শুনতে! অতএব ও বস্তু না দেখে মরছি না। তুমি এই চিঠি পেয়েই খবর নেবে আবার কবে হ'চ্ছে। আর দুখানা দশটাকার টিকিট কিনবে। তারপর আমাকে জানাবে ও যথাসময়ে এম্পায়ারের সামনে হাজির থাকব।"

১৩৩০ বঙ্গাব্দের ২রা মাঘ, অর্থাৎ ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ শরৎ চন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন: "সহস্র প্রকার কাজের মধ্যে সম্প্রতি আপনার যে কিছুমাত্র অবকাশ নেই সে আমরা সকলেই জানি। তবুও আমি এই ভেবে লিখেছিলাম যে, গান আপনার কাছে কথা কহার মতই সহজ, অথচ একমাত্র এর জোরেই আমার নাটকের সব ত্রুটি ঢেকে যেতো।

"সত্যেন্দ্র বেঁচে থাকলে আপনার এই চিঠিখানি দেখিয়ে আজ তার কাছ থেকে অনায়াসে গান আদায় করে আনতে পারতাম। এ চিঠি তার কাছে প্রায় আদেশের মত হোতো। কিন্তু সে পরলোকে এবং আর কেউ নেই যে গিয়ে বলি। কলকাতায় এসে আপনার ত নিশ্বাস নেবার সময় থাকে না।

তখন এই নিয়ে উৎপাত করতে আমি পেরে উঠব না। আমার শত কোটি প্রণাম গ্রহণ করবেন।" (১৬)

'পথের দাবী'

১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ভাদ্রে অথবা ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ৩১এ আগস্ট 'পথের দাবী' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ সরকার বইটি বাজেয়াপ্ত করেন। অথচ এটি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (ডাক নাম বিজু) সম্পাদিত মাসিক পত্র 'বঙ্গবাণী'তে যখন ক্রমশ বেরোয় (১৩২৯ থেকে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ) তখন তাঁরা এর ওপর কোন নজর দেননি। বইটি বাজেয়াপ্ত হলে বিপ্লবীদের কাছে বইটির আদর বেড়ে যায় এবং অনেক বেশি দামে বেচাকেনা হয় ; বঙ্গবাণী থেকে অথবা বই থেকে হাতে নকল ক'রে তাও হাতে হাতে ফেরে।

শরৎচন্দ্র বইটি বাজেয়াপ্ত হ'লে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ চিত্তে এর প্রতিবাদ করার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে অনুরোধ জানান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে কথায় সম্মত না হয়ে লেখেন ঃ "বইখানি উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন ক'রে তোলে।...ইংরেজরাজ ক্ষমা করবেন এই জোরের উপরেই ইংরেজরাজকে আমরা নিন্দা করব সেটাতে পৌরুষ নেই। তাতে ইংরেজ রাজের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়, নিজের প্রতি নয়। রাজ-শক্তির আছে গায়ের জোর, তার বিরুদ্ধে কর্তব্যের খাতিরে যদি দাঁড়াতেই হয়, তাহলে অপর পক্ষে থাকা উচিত চারিত্রিক জোর—অর্থাৎ আঘাতের বিরুদ্ধে সহিষ্ণুতার জোর।...অন্য কোনো প্রাচ্য বা প্রতীচ্য বিদেশীর রাজার দ্বারা এটি হ'ত না। আমরা রাজা হলে যে হতই না সে আমাদের জমিদারের ও ভারতীয় রাজন্যের বহুবিধ ব্যবহারে প্রত্যহই দেখতে পাই। কিন্তু তাই বলে কি কলম বন্ধ করতে হবে ? আমি তা বলিনে—শাস্তিকে স্বীকার ক'রেই কলম চলবে।—শক্তিকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত সইবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। এই কারণেই সেই আঘাতের মূল্য,—আঘাতের গুরুত্ব নিয়ে বিলাপ করলে সেই আঘাতের মূল্য একেবারেই মাটি করে দেওয়া হয়।" চিঠিটার তারিখ ১৩৩৩এর ২৭এ মাঘ। (১৭)

শরৎচন্দ্র নিরাশ হৃদয়ে উমাপ্রসাদকে একখানি চিঠি লেখেন (৬ই ফাল্গুন ১৩৩৩) ঃ

(১৬) ঐ, পৃঃ ৪৫০
(১৭) ঐ পৃঃ ৪৫৫-৫৬

"শ্রীযুক্ত রবিবাবুর চিঠি পেলাম। তাঁর অভিমত মোটের ওপর এই যে, বইখানি পড়লে ইংরাজ গভর্ণমেন্টের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হ'য়ে ওঠে। এবং তাঁর অভিজ্ঞতা এই যে, স্বদেশে বিদেশে যত রাজশক্তি আছে, ইংরাজের মত ক্ষমাশীল আর কেউ নয়। মাত্র বইখানি চাপা দিয়ে আমাকে কিছু না বলা আমাকে ক্ষমা করা। "অর্থাৎ এটুকু বোঝা গেল এ-বই পড়ে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন।" চিঠিখানি সামতাবেড় পানিত্রাস থেকে লেখা। (১৮)

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের চিঠিরও একটি জবাব লিখেছিলেন; কিন্তু বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শে সেটি আর পাঠানো হয়নি। বন্ধুবান্ধবেরা সৎ পরামর্শই দিয়েছিলেন মনে করি। কেননা, চিঠিখানি শরৎচন্দ্রের ক্ষুব্ধ মনের পরিচয় এবং এ চিঠিখানি রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়লে কবির মনও অপ্রসন্ন হয়ে উঠত। পাঠানো হয়নি বলে চিঠিটির কোন উদ্ধৃতিই এখানে দিলাম না। যে-চিঠি পাঠানো হয়নি তা লেখা হয়নি ব'লেই ধরতে হবে। বিশেষ যেখানে এই পাঠানো না-পাঠানোর সঙ্গে দু'জনের সম্বন্ধ তিক্ততর গণ্য হবার আশঙ্কা।

'ষোড়শী' নিয়ে কাছাকাছি

১৩৩৪ বঙ্গাব্দ বা ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে এই সম্বন্ধ দু'জনের মধ্যে বেশ স্বাভাবিক হ'য়ে এসেছে। এই সময় শরৎচন্দ্রের উপন্যাস 'দেনাপাওনা' 'ষোড়শী' নামে নাট্যরূপ পেয়েছে। শরৎচন্দ্র নাটকটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত চেয়ে পাঠান। চিঠি মারফৎ না লোক মারফৎ, শরৎসাহিত্য সংগ্রহে তার উল্লেখ নেই। রবীন্দ্রনাথের মতামত ও তার ওপর শরৎ-চন্দ্রের মন্তব্য দুটি আছে। রবীন্দ্রনাথের চিঠির তারিখ ৪ঠা ফাল্গুন ১৩৩৪, শরৎচন্দ্রের ২৬এ ফাল্গুন ১৩৩৪।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "বাংলা সাহিত্যে নাটকের মত নাটক নেই। আমার যদি নাটক লেখবার শক্তি থাকত তা হলে চেষ্টা করতুম, কেন না, নাটক সাহিত্যের একটা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ।" (১৯)

আমি কদাচিৎ যদি নাটক দেখি, উপভোগ করি; কিন্তু সিন ফেলে বদলে বা ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চের দিক পাল্টাতে যে দেরি হয় তা আমার অনুভূতিকে ক্লিষ্ট করে। খণ্ড খণ্ড দেখেও উপভোগ করি। কিন্তু নাটকের তুলনামূলক

(১৮) ঐ ঐপৃ: পৃঃ ৪৫৪-৫৫
(১৯) শঃ সাঃ সঃ। ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭০

আলোচনা, কোন্‌টা কোন্‌ মাপে উত্তীর্ণ বা ব্যর্থ, তার টেকনিক ইত্যাদি নিয়ে যেসব বড় বড় গবেষণা হয় তার অনেকটাই বুঝিনে। সেক্সপীয়ার নাটক পড়তেও রস পাওয়া যায়, ইংরাজিটা বুঝতে পারলে, আমার ধারণা, তেমন পাঠক কম। কিন্তু ওর ঘটনার মঞ্চদর্শক প্রচুর, সেক্সপীয়ারের সকল কথার ইঙ্গিত তাঁরা কতটা বোঝেন জানিনে। রবীন্দ্রনাথের কোন কোন নাটক ওঁর উপন্যাসেরই রূপান্তর, সেখানে উপন্যাস পড়ে যে সুখ পাওয়া যায়, সব নাটকে সে সুখ পাওয়া যায় না। সাধারণ নটেরা সহজপথ ধরে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য নেয়; সেগুলো নাকি 'হাউস ফুল'ও পায়; আমার প্রায়ই ভাল লাগে না। কিন্তু শিশির ভাদুড়ীর মত জ্ঞানী গুণী নট যখন রবীন্দ্রনাটকেব অনুরাগী তখন তার মাহাত্ম্য স্বীকার ক'রে নিতে হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, "আমার যদি নাটক লেখবার শক্তি থাকত" তখন নাট্যধর্ম উপলব্ধি করব কি আরও ঘাবড়ে যাই। সেই রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে এই ব'লে প্রশংসাপত্র দিচ্ছেন যে,

"আমার বিশ্বাস তোমার নাটক লেখবার শক্তি আছে। ভিতরের প্রকৃতি আর বাইরের আকৃতি এই দুইটি যখন সত্যভাবে মেলে তখন চরিত্র-চিত্র খাঁটি হয়—আমার বিশ্বাস তোমার কলম ঠিকভাবে চললে এই রূপের সঙ্গে ভাব মিলিয়ে তুলতে পারে, কেন না, তোমার দেখবার দৃষ্টি আছে, ভাববার মন আছে, তার উপরে এদেশের লোকযাত্রা সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত।"

৬

জনশ্রুতি যে, 'চিরকুমার সভা'র অহীন্দ্র চৌধুরির চন্দ্রের ভূমিকা দেখে রবীন্দ্রনাথ নাকি বলেছিলেন, Chandra is a character। আবার জীবানন্দের ভূমিকায় শিশির ভাদুড়ীকে দেখে শরৎচন্দ্র বিস্মিত হয়েছিলেন: "বাস্তবিক, কি চমৎকার অভিনয় করে শিশির'। অর্ধেন্দু শেখর মুস্তফীকে বিদ্যাসাগরের জুতো ছুঁড়ে মারা তো একটা প্রবাদ। (যদিও তার প্রমাণ পাওয়া শক্ত, কিন্তু ওতে দুটি জিনিস প্রমাণ করে—বিদ্যাসাগরের হৃদয়াবেগ, যা সত্য, আর, অর্ধেন্দুর অভিনয়—নৈপুণ্য, যা সুবিদিত)। এইটিই ভিতরের প্রকৃতি ও বাইরের আকৃতি; অতএব নাট্যকার লিখলেও মঞ্চে তাকে প্রাণ দেন নট—ভেতরের প্রকৃতি ও বাইরের আকৃতি মিলিয়ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রেকে এই বলে সাবধান করে দেন যে, "তুমি যদি উপস্থিতকালের দাবী ও ভিড়ের লোকের অভিরুচিকে না ভুলতে পারো তাহলে তোমার এই শক্তি বাধা পাবে।"

উপস্থিত বনাম চিরকাল

শরৎচন্দ্র এর জবাবে লিখেছিলেন। "আপনি নানা কাজে ব্যস্ত, কিন্তু আমার ভারি ইচ্ছে হয়, আপনার কাছে গিয়ে এই জিনিসটা ঠিকমত জেনে আসি। কারণ উপস্থিত কালটাও যে মস্ত ব্যাপার, তার দাবী মানবো না বললে, সেও যে, শাস্তি দেয়।—আপনি অনুমতি না দিলে আপনার সময় নষ্ট করে দিতে আমার সঙ্কোচ হয়।"

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "সকল বড় সাহিত্যের যে পরিপ্রেক্ষিত (perspective) সেটা দূরব্যাপী, সেইটির সঙ্গে পরিমাণ রক্ষা করতে পারলে তবেই সাহিত্য টিঁকে যায়—কাছের লোকের কলরব যখন দেয়াল হয়ে সঙ্কীর্ণ পরিবেষ্টনে তাকে অবরুদ্ধ করে, তখন সে খর্ব হয়ে অসত্য হয়ে যায়।"

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসাছলে বলেছেন, "রামায়ণে রাম-রাবণের যুদ্ধের বিবরণ অনেক জায়গা জুড়ে আছে।—যুদ্ধক্ষেত্রে এ ব্যাপার ছোটও নয় তুচ্ছও নয়, এবং কবির কাছে হয়ত সেকালের লোকে ভিড় কোরে চেয়েছিল, এবং পেয়ে অকৃত্রিম আনন্দও উপভোগ করেছিল। কিন্তু আজ সুদূর ব্যবধানে যুদ্ধ-ক্ষেত্রের ও যুদ্ধার্থী বীরগণের যুদ্ধকৌশল অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেছে, সাহিত্যের দূরব্যাপী perspective বলতে কি আপনি এই ধরণের জিনিসই ইঙ্গিত করেছেন?"

—শরৎচন্দ্র আরও বলেছেন, ছবির perspective এবং সাহিত্যের perspective, কথার দিক দিয়ে এক হলেও কাজের দিক দিয়ে হয়ত এক নয়। তা ছাড়া সাহিত্যের বর্তমান কালটা যত বড় সত্য, ভবিষ্যৎ কালটা কিছুতেই ঠিক অত বড় সত্য নয়।'.

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ষোড়শীতে তুমি উপস্থিত কালকে খুসি করতে চেয়েচ, এবং তার দামও পেয়েচ। কিন্তু নিজের শক্তির গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করেচ। যে ষোড়শীকে এঁকেচ সে এখনকার কালের ফরমাসের, মনগড়া জিনিষ, সে অন্তরে বাহিরে সত্য নয়। আমি বলিনে যে এই রকম ভাবের ভৈরবী হতে পারে না.........যে কাহিনীর মধ্যে আমাদের পাড়াগায়ের সত্যকার ভৈরবী আত্মপ্রকাশ করতে পারে সে এই কাহিনী নয়। সৃষ্টিকর্ত্তা-রূপে তোমার ভৈরবীকে একান্ত সত্য করা, লোকরঞ্জনকর আধুনিক কালের চলতি সেন্টিমেন্ট-মিশ্রিত কাহিনী রচনা করা নয়।"

শরৎচন্দ্র জবাবে লিখেছেন: "ষোড়শীর সম্বন্ধে আপনি ঠিক যে কি

বলেছেন আমি বুঝতে পারিনি। শুধু এই টুকুই বুঝেচি, এ যে ঠিক হয়নি, সে আপনার দৃষ্টি এড়ায়নি।"

কিন্তু পত্রের সূচনায় বলেছেন, "ষোড়শী সম্বন্ধে আপনার অভিমত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করেছি।" কৈফিয়ৎ হিসেবে বলেছেন, "এই নাটকখানা লিখেছি আমার একটা উপন্যাস অবলম্বন করে।......উপন্যাস থেকে নাটক তৈরির চেষ্টা করতে গেলে.......কাজটা হয়ত সহজ হয়, ত্রুটিও হয় প্রচুর, হয়েছেও তাই।......এটা লিখি একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জানা বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি কোরে। সে জানাই হ'লো আমার বিপদ। লেখবার সময় পদে পদে জেরা করে সে আমার কল্পনার আনন্দ ও গতিকে কেবল বাধাই দেয়নি, বিকৃত করেছে। সত্য ঘটনার সঙ্গে কল্পনা মেশাতে গেলেই বোধ হয় এমনি ঘটে। জগতে দৈবাৎ যা সত্যাই ঘটেছে তার যথাযথ বিবৃতিতে ইতিহাস রচনা হ'তে পারে, কিন্তু সাহিত্য রচনা হয় না। অথচ সত্যের সঙ্গে কল্পনা মিলিয়ে হোলো আমার ষোড়শী।"

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: জানি আমার কথায় তুমি রাগ করবে। কিন্তু তোমার প্রতিভার 'পরে শ্রদ্ধা আছে বলেই আমি সরল মনে আমার অভিমত তোমাকে জানালুম। নইলে কোন দরকার ছিল না। সাহিত্যে তুমি বড় সাধক, ইন্দ্রদেব যদি সামান্য প্রলোভনে তোমার তপোভঙ্গ করে তাহলে লোকসান সাহিত্যের। তুমি উপস্থিত কালের কাছ থেকে দাম আদায় ক'রে খুসি থাকতে পারো—কিন্তু সকল কালের জন্য কি রেখে যাবে ?"

শরৎচন্দ্র লিখেছেন: "সাধারণের কাছে সমাদর লাভ করা গেল প্রচুর কিন্তু আপনার কাছে দাম আদায় হোলো না। এ আমার বাইরের পাওয়া সমস্ত প্রশংসাই নিষ্ফল করে দিলে।"

শরৎচন্দ্র দীর্ঘ চিঠির শেষ লাইনে লিখেছেন: লেখার দোষে কোথাও যদি অপরাধ হয়ে থাকে মার্জ্জনা করবেন।" (২০)

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লেখা ঐ চিঠিতে আরও বলেছেন: "আমি পূর্বে কখনো নাটক লিখিনি। এখন দু'একটা লেখার ইচ্ছে হয়, কিন্তু বাধা বিস্তর। আমার উপন্যাসের বিচার পাঠকসমাজ করেন, তার প্রশস্ত ক্ষেত্র, কিন্তু নাটকের পরীক্ষক যে কে বোঝা কঠিন। থিয়েটারবালারা, না বোকা দর্শকেরা—কোথায় যে এর হাইকোর্ট তা কেউ জানে না। রামায়ণ মহাভারত

(২০) শঃ সাঃ সঃ, ১০ম সম্ভার, পৃঃ ৩৭০।

থেকে কিংবা তেমনি প্রতিষ্ঠিত টড্‌সাহেবের রাজস্থান থেকে নাটক লিখলে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া যায়, কিন্তু আপনার কাছে তাড়া খেতে হয়।"

কেন নাটক লিখি না

উল্লেখযোগ্য, শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়কে নাটক প্রসঙ্গে একখানি চিঠিতে লিখেছেন, "তোমার প্রশ্ন আমি নাটক লিখি না কেন?

"তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমার প্রথম কথা এই যে, আমি নাটক লিখি না, তার কারণ হচ্ছে আমার অক্ষমতা। দ্বিতীয়, অক্ষমতাকে অস্বীকার করে যদিইবা নাটক লিখি, তাহলেও আমার মজুরি পোষাবে না।...উপন্যাস লিখলে মাসিক পত্রের সম্পাদক সাগ্রহে তা নিয়ে যাবেন, উপন্যাস ছাপাবার জন্যে পাব্লিশারের অভাব হবে না।...গল্পের ধারাটা আমি জানি।...কিন্তু নাটক? রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষই হচ্ছেন এর চরম হাইকোর্ট।...তাঁদের রায়ই এ-সম্বন্ধে শেষ কথা। সুতরাং, এ বিপদের মধ্যে খামাকা ঢুকে পড়তে মন আমার দ্বিধা বোধ করে।......নাটক হয়ত আমি লিখতে পারি। কারণ, নাটকের যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু......সেই ডায়ালোগ লেখার অভ্যাস আমার আছে।...এ ছাড়া চরিত্র বা ঘটনা-সৃষ্টির কথা যদি বল, তাও পারি বলে বিশ্বাস করি। নাটকে ঘটনা বা সিচুয়েশন সৃষ্টি করতে হয় চরিত্র-সৃষ্টির জন্যেই। চরিত্র-সৃষ্টি দু-রকমের হতে পারে ঃ এক হচ্ছে, প্রকাশ অর্থাৎ পাত্র-পাত্রী যা, তাই ঘটনা পরম্পরার সাহায্যে দর্শকের চোখের সুমুখে প্রকাশিত করা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে—চরিত্রের বিকাশ অর্থাৎ ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে তার জীবনের পরিবর্ত্তন দেখানো।......কিন্তু ভাবি, ক'রে কি হবে? নাটক যে লিখব, তা অভিনয় করবে কে? শিক্ষিত বোঝদার অভিনেতা বা অভিনেত্রী কৈ?"...

অবশ্য তিনি শিশির ভাদুড়ীর অভিনয় প্রশংসাকালে বলেছেন, "আরও চমৎকার তার শিখানোর পদ্ধতি।...অদ্ভুত ধৈর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে শিশির শেষের লক্ষ্যটায় লেগে থাকতে পারে। তারই বাহাদুরি।"

পর্বতো বহ্নিমান্

চিঠিটা শ্রীমতী রাধারাণী দেবীকে ১৯২৭-এর ১০ই অক্টোবরে লেখা। তাতে রবীন্দ্র প্রসঙ্গে আছে ঃ

"আমার লেখা 'সাহিত্যের রীতি-নীতি' পড়ে তুমি ক্ষুণ্ণ হয়েচো লিখেচো। তোমার মনে হয়েচে যে রবিবাবুকে আমি অযথা কটূক্তি করেচি। কিন্তু

কোথায় যে শ্লেষ অথবা বিদ্রূপ আছে লেখাটা আরও একবার পড়েও ত আমি খুঁজে পেলাম না। তাঁকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করি—আমার গুরুস্থানীয় তিনি, এ ত তুমি জানোই। তবে হয়ত লেখার দোষে যা বলতে চেয়েছি বলতে পারিনি—তার এক রকমের অর্থ হয়ে গেছে। দোষ যদি কিছু হয়েও থাকে সে আমার অক্ষমতার, আমার অন্তরের নয়।

"কোন দিন যদি তোমার বড়দাকে ভালো করে জানতে পারো ত বুঝবে···বিদ্বেষ বলে জিনিসটা তার মধ্যে নেই বললেও অতিশয়োক্তি হবে না।······'পথের দাবী' যখন বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল তখন রবিবাবুকে গিয়ে বলি যে, আপনি যদি একটা প্রতিবাদ করেন ত একটা কাজ হয় যে পৃথিবীর লোক জানতে পারে যে গভর্ণমেণ্ট কিরকম সাহিত্যের প্রতি অবিচার করেচে। অবশ্য বই আমার সঞ্জীবিত হবে না। ইংরাজ সে পাত্রই নয়। তবু সংসারের লোকে খবরটা পাবে। তাঁকে বই দিয়ে আসি। তিনি জবাবে আমাকে লেখেন—'পৃথিবী ঘুরে ঘুরে দেখলাম ইংরাজ রাজশক্তির মত সহিষ্ণু ক্ষমাশীল রাজশক্তি আর নেই। তোমার বই পড়লে পাঠকের মন ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। তোমার বই চাপা দিয়ে তোমাকে কিছু না বলা তোমাকে ক্ষমা করা। এই ক্ষমার উপর নির্ভর করে গভর্ণমেণ্টকে যা' তা' নিন্দাবাদ করা সাহসের বিড়ম্বনা।'

"ভাবতে পারো বিনা অপরাধে কেউ কাউকে এত বড় কটূক্তি করতে পারে? এ চিঠি তিনি ছাপাবার জন্যেই দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি ছাপাতে পারিনে এই জন্যে যে কবির এত বড় সার্টিফিকেট তখুনি স্টেটসম্যান প্রভৃতি ইংরাজি কাগজওয়ালারা পৃথিবীময় তার করে দেবে। এবং এই যে আমাদের দেশের ছেলেদের বিনা বিচারে জেলে বন্ধ করে রেখেচে এবং এই নিয়ে যত আন্দোলন হচ্ছে সমস্ত নিষ্ফল হ'য়ে যাবে। ঠিক বলতে পারিনে, হয়ত এই কথা আমার মনের মধ্যে অলক্ষ্যে ছিল যখন 'সাহিত্যের রীতি নীতি' লিখি। তাতেই বোধ হয় কোথাও কোন জায়গায় একটু আধটু তীব্রতার ঝাঁঝ এসে গেছে। যাই হোক, যা হয়ে গেছে তার আর উপায় কি ভাই?"

শ্রীভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায় তাঁর "বিপ্লবতীর্থে"র পরিশিষ্টে লিখেছেন, 'বেণু'র বৈশিষ্ট্যে সাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্র বিস্ময় মেনেছিলেন। মু শরৎচন্দ্র হেমচন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব ঘটিয়ে 'বেণু'র কর্মীদেরকে ছোট ভাইগুলোর মত ভালবেসে ফেলেছিলেন। তৎকালে শরৎচন্দ্রের লেখা 'বেণু' ব্যতীত

অপর কোন কাগজেই বড় একটা বেরুতো না। চিঠি ও প্রবন্ধাদি ছাড়া 'বিপ্রদাস' উপন্যাসখানিই তিনি ধারাবাহিকরূপে 'বেণু'তে প্রকাশিত হতে দিচ্ছিলেন।……একদিন 'ভারতবর্ষে'র উৎসুক কর্তৃপক্ষ শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন কোরে জানতে চান যে কত অর্থের বিনিময়ে তিনি 'বেণু'র ছোকরাদেরকে তাঁর লেখা দিচ্ছেন। উত্তরে স্মিতহাস্যে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী বলেন: 'ওরা দেবে টাকা? কোথায় পাবে? ওদেরকেই আমার সাহায্য করা উচিত—কিন্তু তা পারি কই?' একটু স্তব্ধ থেকে আবার বলেন শরৎচন্দ্র: ওদের সঙ্গে যে আমার রক্তের পরিচয়। জন্মান্তরের আত্মীয়তা —ওদের কাছ থেকে নেব টাকা? বল কি তোমরা?

"শরৎচন্দ্র বহুদিন 'বেণু'র কর্মীদেরকে বলেছেন: দ্যাখো তোমরা বড় দেখে একটা বাড়ি নিয়ে 'বেণু'র আফিস কর—আমি প্রায়ই যাবো, কোলকাতা গিয়ে ওখানেই উঠবো—দেখবে, বাঙলার সাহিত্যিক গোষ্ঠী তোমাদের সঙ্গে কেমন আত্মীয়তা করেন।" তা অবশ্য সম্ভব হয়নি। "এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই সময় 'বেণু'র সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে শরৎচন্দ্রের পিস্তল ও রাইফেলের লাইসেন্স পুলিশ কর্তৃক বাতিল হয় এবং উক্ত আগ্নেয়াস্ত্রগুলি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়।"

'বেণু' গোষ্ঠিরই "চলার পথে" নামে একটি ছোট গল্পের বই বেরোয়। বেরিয়েছিল ১৯২৯ সালের শেষের দিকে। তার ভূমিকাপত্রে সাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্র সস্নেহে লিখেছিলেন: 'পথের দাবী' যখন সরকারে বাজেয়াপ্ত হয় পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ আমাকে লিখেছিলেন তোমার বক্তব্য যদি প্রবন্ধাকারে লিখতে তার মূল্য অল্পই থাকতো। কিন্তু গল্পচ্ছলে যা দিয়েছো দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই। চলার পথের' সম্বন্ধেও আমি এই আশীর্বাদ করি। এবং বলি, বাঙলা দেশের সমস্ত ছেলেমেয়েদের এই বইখানি পড়ে দেখা উচিত।" (২০শে অগ্রহায়ণ, '৩৬)

সাহিত্যের রীতি নীতি

"সাহিত্যের রীতি ও নীতি"তে শরৎচন্দ্র লিখেছেন—শ্রাবণ মাসে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ধর্ম নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন।……প্রিয়পাত্ররা গিয়া কবিকে ধরিয়াছে, মশাই, আমরা ত আর পারিয়া উঠিনা, এবার আপনি অস্ত্র ধরুন। না, না, ধনুর্ব্বাণ নয়,—গদা।

(২১) শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ, ৮ম সম্ভার, পৃঃ ৩৬৯

(২২) [সাহিত্য ধর্ম, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪খণ্ড, পৃঃ ৩২৬]

ঘুরাইয়া দিন ফেলিয়া ওই অতি-আধুনিক সাহিত্যিক পল্লীর দিকে।……কবির সেই গদাটাই অন্ধকারে আকাশ হইতে পড়িয়াছে। ইহাতে ঈপ্সিত লাভ না হোক, শব্দ এবং ধূলা উঠিয়াছে প্রচুর। নরেশচন্দ্র…বিনীত ক্রুদ্ধকণ্ঠে বারংবার প্রশ্ন করিতেছেন, কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন বলুন? কেন করিয়াছেন বলুন?

"কিন্তু এই প্রশ্নই অবৈধ। কারণ, কবি ত থাকেন বারো মাসের মধ্যে তেরো মাস বিলাতে। কি জানেন তিনি, কে আছে তোমাদের খড়্গহস্তা শুচি-ধর্ম্মী অনুরূপা, আর কে আছে তোমাদের-বংশীধারী অশুচি-ধর্ম্মী শৈলজা প্রেমেন্দ্র-নজরুল-কল্লোল-কালিকলমের দল? কি করিয়া জানিবেন তিনি, কবে কোন্ মহিয়সী জননী অতি-আধুনিক সাহিত্যিক দলন করিতে ভবিষ্যৎ মায়েদের সুতিকা-গৃহেই সন্তান-বধের সদুপদেশ দিয়া নৈতিক উচ্ছ্বাসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, আর কবে শৈলজানন্দ কুলি-মজুরের নৈতিকহীনতার গল্প লিখিয়া আভিজাত্য খোয়াইয়া বসিয়াছে? এ-সকল অধ্যয়ন করিবার মত সময়, ধৈর্য্য এবং প্রবৃত্তি কোনটাই কবির নাই, তাঁহার অনেক কাজ। দৈবাৎ এক আধটা টুকরা-টাকরা লেখা যাহা তাঁহার চোখে পড়িয়াছে তাহা হইতেই তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে, আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যের আব্রুতা এবং আভিজাত্য দুই-ই গিয়াছে। সুরু হইয়াছে চিৎপুর রোডের খচো-খচো-খচ্‌কার যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত গর্জ্জন। আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতি কবির এতবড় অবিচারে শুধু নরেশচন্দ্রের নয়, আমারও বিস্ময় ও ব্যথার অবধি নাই।

"…তাঁহার নিশ্চয় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, আধুনিক সাহিত্যে কেবল সত্যের নাম দিয়া নরনারীর যৌন মিলনের শারীর ব্যাপারটাকেই অলঙ্কৃত করা চলিয়াছে। তাহাতে লজ্জা নাই, সম্রম নাই, শ্রী নাই, সৌন্দর্য্য নাই, রস-বোধের বাষ্প নাই,—আছে শুধু ফ্রয়েডের সাইকো-এনালিসিস। অথচ, যে-কোন সাহিত্যিককেই যদি তিনি ডাকিয়া পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন ত শুনিতে পাইতেন, তাহারা প্রত্যেকেই জানে, সত্যমাত্রই সাহিত্য হয় না;…

"কিন্তু একথাও আমি বলি না যে, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে দুঃখ করিবার আদৌ কারণ ঘটে নাই, কিংবা রবীন্দ্রনাথের এবংবিধ মনোভাব একেবারেই আকস্মিক। তাঁহার হয়ত মনে নাই, কিন্তু বছর কয়েক পূর্ব্বে আমাকে একবার বলিয়াছিলেন, সেদিন তাঁহার বিদ্যালয়ের একটি বারো তেরো বছরের ছাত্র 'পতিতা'র সম্বন্ধে একটা গল্প লিখিয়াছে।……

"এ তো গেল অসাধু সাহিত্যের দিক। আবার সাধু সাহিত্যের দিকেও তরুণ কবির অভাব নাই।" ব'লে শরৎচন্দ্র 'কেতকী' পত্রিকায় প্রকাশিত ও অনূর্ধ ১৫।১৬ বছরের তরুণ বা তরুণী রচিত একটি রবীন্দ্রানুকৃত গানের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেন। তারপর বলেন, "সাহিত্য-সৃষ্টি অনুকরণের মধ্যে নাই। ভালরও না মন্দেরও না।......বৃদ্ধ কবির গীতাঞ্জলিও যত বড় ক্যাব্যগ্রন্থ, তাঁহার যৌবনের চিত্রাঙ্গদাও ঠিক তত বড়ই কাব্য-সৃষ্টি—লাঞ্ছনার আঘাত ও গৌরবের মালা যেমন করিয়াই তাঁহার শিরে বর্ষিত হোক না। অথচ অনুভূতিহীন বাক্য যত অলঙ্কৃতই হোক ব্যর্থ। পতিতার অনুকরণও ব্যর্থ, গীতাঞ্জলির অনুকরণও ঠিক ততখানিই ব্যর্থ। দেশের সাহিত্য-সম্পদ ইহাতে কণামাত্রও বর্দ্ধিত হয় না।

"কবির বোধের ক্ষুধা ও আত্মার ক্ষুধা ঠিক যে কি এবং কিসে মেটে সে আমার অনধিগম্য। কিন্তু একটা কথা জানি যে, কাব্যসাহিত্য ও কথা-সাহিত্য এক বস্তু নয়। আধুনিক উপন্যাস-সাহিত্য ত নয়ই। 'সোনার তরী'র যা লইয়া চলে. 'চোখের বালি'র তাহাতে কুলায় না। সজিনা ফুলে, বকফুলে 'সোনার তরীর' প্রয়োজন নাই, কিন্তু বিনোদিনীর রান্নাঘরে সেগুলা না হইলেই নয়।

"কবি সাহিত্য ধর্ম প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

"মধ্যযুগে একসময়ে য়ুরোপে শাস্ত্র-শাসনের খুব জোর ছিল। তখন বিজ্ঞানকে সেই শাসন অভিভূত করেছে। সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘোরে একথা বলতে গেলে মুখ চেপে ধরেছিল—ভুলেছিল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের একাধিপত্য—তার সিংহাসন ধর্মের রাজত্ব-সীমার বাইরে। আজকের দিনে বিপরীত হ'ল। বিজ্ঞান প্রবল হ'য়ে উঠে কোথাও আপনার সীমা মানতে চায় না। তার প্রভাব মানব-মনের সকল বিভাগেই আপন পিয়াদা পাঠিয়েছে। নূতন ক্ষমতার ভকৃমা পরে কোথাও সে অনধিকার প্রবেশ করতে কুণ্ঠিত হয় না। বিজ্ঞান পদার্থটা ব্যক্তি-স্বভাববর্জিত—তার ধর্মই হচ্ছে সত্য সম্বন্ধে অপক্ষপাত কৌতূহল। এই কৌতূহলের বেড়াজাল এখনকার সাহিত্যকেও ক্রমে ক্রমে ঘিরে ধরেচে।'

"বিজ্ঞানের প্রতি কবির হয়ত একটা স্বাভাবিক বিমুখতা আছে, কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বলিতে......যদি sex-psychology, anatomy অথবা gynaecology বুঝাইত, তাহা হইলে সাহিত্যের মধ্যে ইহার অবারিত প্রবেশে আমিও বাধা দিতাম। কেবল অবাঞ্ছিত বলিয়া নয়, অহেতুক ও অসঙ্গত

বলিয়া আপত্তি করিতাম।...বিজ্ঞান ত কেবল অপক্ষপাত কৌতূহলমাত্রই নয়, কার্যকারণের সত্যকার সম্বন্ধ বিচার।...কিন্তু তাই বলিয়া...গল্পের ছলে ধাত্রীবিদ্যা শিখানকেও আমি সাহিত্য বলি না, উপন্যাসের আকারে কামশাস্ত্র প্রচারকেও আমি সাহিত্য বলি না।...

"বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া ধর্মপুস্তক রচনা করা যায়, আধ্যাত্মিক কবিতা রচনা করা যায়, রূপকথা সাহিত্যও রচনা করা না যায় তাহা নহে, কিন্তু উপন্যাস-সাহিত্যের ইহা শ্রেষ্ঠ পন্থা নহে।"

কাব্যসাহিত্য বনাম কথাসাহিত্য

কোন এক সাহিত্যিকের নামোল্লেখ ক'রে এবং তাঁর গ্রন্থ থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে শরৎচন্দ্র আবারও বলেছেন, "কাব্য-সাহিত্য ও কথা-সাহিত্য এক বস্তু নয়। ইহাদের ধর্মও এক নয়, ধর্মের সীমানাও এক নয়।"

লক্ষ্যণীয় এই যে, ১৯২১-এ শিক্ষার মিলন"-এর প্রতিবাদে শরৎচন্দ্র যখন "শিক্ষার বিরোধ" লেখেন তখনকার তুলনায় এ লেখার যুক্তি ও তথ্য পরিবেষণ অনেক পরিণত ও প্রাসঙ্গিক। যেভাবে বা যে-কারণেই হোক শরৎচন্দ্র সাহিত্য-বিষয়ে যখন বলেন তখন তা অনেক স্পষ্টতর ও সামঞ্জস্য পূর্ণ, সেখানে তিনি যেন স্বাধিকারে প্রাঞ্জল, রাজনৈতিক প্রশ্নে সে স্পষ্টতা, ঋজুতা ও সামঞ্জস্যের অভাব। তিনি এখানে বলেছেন,

"কবি তাঁহার 'সাহিত্য-ধর্মে' নর-নারী যৌন-মিলন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমার মনে হয় উপন্যাস-সাহিত্যেও তাহা খাঁটি কথা। তাঁহার বক্তব্য বোধ হয় ইহাই যে, ঐ ব্যাপারটা ত আছেই। কিন্তু মানুষের মাঝে যে ইহার দু'টি ভাগ আছে, একটি-দৈহিক এবং অপরটি মানসিক, একটি পাশব ও অন্যটি আধ্যাত্মিক, ইহার কোন্ মহলটি-যে সাহিত্যে অলঙ্কৃত করা হইবে এইটিই আসল প্রশ্ন। বাস্তবিক, ইহাই হওয়া উচিত আসল প্রশ্ন। নরেশচন্দ্র [সেনগুপ্ত] বলিতেছেন, ইহার সামা নির্দেশ করিয়া দাও। কিন্তু সুস্পষ্ট সীমা-রেখা কি ইহার আছে না কি যে, ইচ্ছা করিলেই কেহ আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবে? সমস্তই নির্ভর করে লেখকের শিক্ষা, সংস্কার, রুচি ও শক্তির উপরে। একজনের হাতে যাহা রসের নির্ঝর, অপরের হাতে তাহাই কদর্য্যতায় কালো হইয়া উঠে। শ্লীল, অশ্লীল, আব্রু, বে-আব্রু এ-সকল তর্কের কথা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার আসল উপদেশটি সকল সাহিত্য-সেবীরই সবিনয়ে গ্রহণ করা উচিত। নর-নারীর যৌন মিলন যে

সকল রস-সাহিত্যের ভিত্তি, এ সত্য কবি অস্বীকার করেন নাই। তথাপি কথাটি বোধ হয় তাঁহার এই যে, ভিত্তির মত ও বস্তুটি সাহিত্যের গভীর ও গোপন অংশেই থাক্। বনিয়াদ যত নীচে এবং যতই প্রচ্ছন্ন থাকে অট্টালিকা ততই সুদৃঢ় হয়; ততই শিল্পীর ইচ্ছামত তাহাতে কারুকার্য্য রচনা করা চলে। গাছের শিকড় গাছের জীবন ও ফুল-ফলের পক্ষে যত প্রয়োজনীয়ই হোক তাহাকে খুঁড়িয়া উপরে তুলিলে তাহার সৌন্দর্য্যও যায়, প্রাণও শুকায়। এ-সত্য যে অভ্রান্ত তাহা ত না বলা চলে না।"

চুম্বন, আলিঙ্গন

নরেশচন্দ্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত ক'রে দেখিয়েছেন চুম্বন ও আলিঙ্গন সাহিত্যে পাকা ক'রে দিয়েছেন বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ। এক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র যথার্থই বলেছেন, "কিন্তু আলিঙ্গন ত দূরের কথা, চুম্বন কথাটাও আমার বইয়ের মধ্যে নিতান্ত বাধ্য না হইলে দিতে পারি না।"

বাধ্য হয়ে কিনা জানিনে, পরিণীতায় ও গৃহদাহে চুম্বন আছে, কিন্তু তা নিতান্তই আলগোছে নয়। তথাপি একথা শরৎচন্দ্রের সত্য যে, "ওটা পাশ কাটাইতে পারিলেই বাঁচি। নর-নারীর মধ্যে ইহা আছেও জানি, চলেও জানি, দোষেরও বলিতেছিনা, তবুও কেমন যেন পারিয়া উঠি না। আমাদের সমাজে এ-বস্তুটিকে লোকে গোপন করিতে চাহে বলিয়াই বোধ হয় সুদীর্ঘ সংস্কারে য়ুরোপীয় সাহিত্যের ন্যায় ইহার প্রকাশ্য demonstration-এ লজ্জা করে। খুব সম্ভব আমার দুর্বলতা। কিন্তু ভাবি, এই দুর্বলতা লইয়াই ত অনেক প্রণয়-চিত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছি, মুস্কিলে তো পড়ি নাই।"

মুস্কিল দূরস্থান, এই লজ্জা বা দুর্বলতাই শরৎ-সাহিত্যকে সুন্দরতর ক'রে শ্রী দিয়েছে, বেশি আকর্ষণযোগ্য করেছে। ডাক্তার কোন পারগেটিভ দিলে সেই ইঙ্গিতই যথেষ্ট—রোগীর সংগে প্রতিবার যে শৌচাগারে না ছুটলে স্বস্তি পায় না সে-লেখক নিজেই অসুস্থ, সে সৌন্দর্য সৃষ্টি করবে কি ?

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্যের উল্লেখ ক'রে বলেছেন, "কথা-সাহিত্যে আমারই মত কবি এ দৌর্বল্য কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই।"

শরৎচন্দ্রের একথাটির মধ্যেও যুক্তি আছে যে, "বিদেশের আমদানি কথাটা তাঁহার ক্ষোভেরই কথা। দেশভেদে সাহিত্যের ভাষা আলাদা হয়, কিন্তু সত্যকার সাহিত্যের যে দেশ-বিদেশ নাই এ সত্য কবি জানেন···তা না হইলে আজ বিশ্বসুদ্ধ লোকে তাঁহাকে বিশ্বের কবি বলিয়া মর্যাদা দিত না।

পালাবদল

এরপর শরৎচন্দ্র যে কথাগুলো বলেছেন তা যেমন সঙ্গত তেমনি প্রণিধানযোগ্য। এবং সব চাইতে আশ্চর্য, শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথে যেন স্থান পাল্টাপাল্‌টি হয়েছে 'শিক্ষার মিলন' 'শিক্ষার বিরোধ' কাল থেকে একালে। কালের ব্যবধানও দশবছরের ওপর। ১৯২১-এ বিদেশী-শিক্ষার বিরোধ ছিল শরৎচন্দ্রের মনে (কেননা, ওটা ছিল অসহযোগ আন্দোলনের স্বপক্ষ যুক্তি) এখন ১৯৩২এ তা মিটে গেছে, এখন এই প্রত্যয় জন্মেছে যে, "Idea পশ্চিমের কি উত্তরের, ইহা বড় কথা নয়, স্বদেশের কি বিদেশের তাহাও বড় কথা নয়, বড় কথা ইহা ভাষার ও জাতির কল্যাণকর কিনা।...... সাহিত্যিকের শুভবুদ্ধি কল্যাণের নিমিত্তই ইহার আমদানী প্রয়োজনীয় জ্ঞান করে, এমন কেহই নাই যে তাহার কণ্ঠরোধ করিতে পারে। যত মত-ভেদই থাক্, গায়ের জোরে রুদ্ধ করিবার চেষ্টায় মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই অধিক হয়। কিন্তু এই সকল অত্যন্ত মামুলি কথা কবিকে স্মরণ করাইয়া দিতে আমার নিজেরই লজ্জা করিতেছে।.........

"কিন্তু উপসংহারে আরও দুই একটা সত্য কথা সোজা করিয়াই কবিকে জানাইব। তাঁহার 'সাহিত্য-ধর্ম' প্রবন্ধ শেষ দিকটার ভাষাও যেমন তীক্ষ্ণ, শ্লেষও তেমনি নিষ্ঠুর।......সত্যই কি আধুনিক বাঙলা সাহিত্য রাস্তা ধূলা পাঁক করিয়া তুলিয়া পরস্পরের গায়ে নিক্ষেপ করাটাকেই সাহিত্য-সাধনা জ্ঞান করিতেছে?"

সাহিত্যধর্ম

রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য ধর্ম'-এর শেষ দিকটায় এই রকম আছে ঃ

"এই ল্যাঙট-পরা গুলি-পাকানো ধূলোমাখা আধুনিকতার একটা স্বদেশী দৃষ্টান্ত দেখেছি হোলিখেলার দিন চিৎপুর রোডে। সেই খেলায় আবীর নেই, গুলাল নেই, পিচকারি নেই, গান নেই, লম্বা লম্বা ভিজে কাপড়ের টুকরো দিয়ে রাস্তার ধূলোকে পাঁক করে তুলে তাই চীৎকার শব্দে পরস্পরের গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাগলামি করাকেই জনসাধারণ বসন্ত উৎসব বলে গণ্য করেছে। পরস্পরকে মলিন করাই তার লক্ষ্য, রঙিন করা নয়।

"সাহিত্যে রসের হোলিখেলায় কাদা মাখামাখির পক্ষ সমর্থন উপলক্ষে অনেকে প্রশ্ন করেন সত্যের মধ্যে এর স্থান নেই কি? এ প্রশ্নটাই অবৈধ।

উৎসবের দিনে ভোজপুরীর দল যখন মাতলামির ভূতে-পাওয়া মাদল-করতালের খচোখচোখচ্‌কারযোগে একঘেয়ে পদের পুনঃ পুন আবর্তিত গর্জনে পীড়িত সুরলোককে আক্রমণ করতে থাকে তখন আর্ত ব্যক্তিকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই অনাবশ্যক যে এটা সত্য কিনা; যথার্থ প্রশ্ন হ'চ্ছে, এটা সংগীত কিনা।······এ পৌরুষ চিৎপুর রাস্তার, অমরপুরীর সাহিত্য-কলার নয়।

"সম্প্রতি যে দেশে বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাবে অলজ্জ কৌতূহলবৃত্তি দুঃশাসন মূর্তি ধরে সাহিত্য-লক্ষ্মীর বস্ত্রহরণের অধিকার দাবি করছে সে দেশের সাহিত্য অন্তত বিজ্ঞানেব দোহাই পেড়ে এই দৌরাত্মের কৈফিয়ৎ দিতে পারে। কিন্তু যে দেশে অন্তরে-বাহিরে বুদ্ধিতে ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনোখানেই প্রবেশাধিকার পায়নি সে দেশেব সাহিত্যে ধার কবা নকল নির্লজ্জতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দেবে।"(২৩)

শরৎচন্দ্র শেষ অনুচ্ছেদ সম্পর্কে বলেছেন, "এই যদি সত্য হইয়া থাকে ত ভারতের দুঃখের কথা, দুর্ভাগ্যের কথা। হয়ত [বিজ্ঞান কোনখানেই] প্রবেশাধিকার পায় নাই, হয়ত এ বস্তু সত্যই ভারতে ছিল না, কিন্তু কোন একটা জিনিস কেবল ছিল না বলিয়াই কি চিরদিন বর্জ্জিত হইয়া থাকিবে? ······(বাঙলা দেশের) 'সাহিত্যের ধার-করা নকল নির্লজ্জতাকে' দোহাই দেওয়ার প্রয়োজন নাই, চাপা দেওয়াও অন্যায়, কিন্তু ভক্তের মুখের ধার-করা অভিমতটাকেই অসংশয়ে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাতেই কি ন্যায়ের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না?"

ভক্তদের কথায় নির্ভর ক'রে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটি লিখেছেন, এটি শরৎচন্দ্রের অনুমান। "ওদিকে কথাটা ঠিক জানি না, কিন্তু অনুমান করিতে পারি। প্রিয়পাত্ররা গিয়া কবিকে গিয়া ধরিয়াছে।

রণক্ষেত্রে নরেশচন্দ্র

প্রবন্ধটির প্রথম জবাব দিয়েছেন ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রচুর বই, খ্যাতি ও অখ্যাতি আছে। কৌতুকের কথা এই যে, শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আধুনিক লেখকদের সম্পর্কে যে অজ্ঞানতার ও ভক্ত মুখে শোনার অভিযোগ করেছেন, নরেশচন্দ্র সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ তোলা চলে তাঁর নিজের স্বীকৃতি থেকে। শরৎ-

(২৩) রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪ খণ্ড, পৃঃ ৩৩১

চন্দ্রের অভিযোগ ছিল, শৈলজা প্রমুখের রচনা পড়বার সময় কৈ কবির? শরৎচন্দ্র নরেশচন্দ্র সম্পর্কে বলছেন: তাঁহার সকল বই আমি পড়ি নাই, মাসিকের পৃষ্ঠায় যাহা প্রকাশিত হয় তাহাই শুধু দেখিয়াছি।......কিন্তু পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানে, ভাষার অধিকারে, চিন্তার বিস্তারে এবং সর্ব্বোপরি স্বাধীন অভিমতের অকুণ্ঠিত প্রকাশে বাঙলা সাহিত্যে তাঁহার সমতুল্য লেখক অল্পই আছেন। বাঙলা-সাহিত্যের অবিসংবাদী বিচারক হিসাবে কবির কর্ত্তব্য ইঁহার সমগ্র পুস্তক পাঠ করা, কোথায় বা শ্লীলতার অভাব, কোথায় বা কাব্য-লক্ষ্মীর বস্ত্রহরণে ইনি নিযুক্ত, স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেওয়া। তবে এমনও হইতে পারে, কবির লক্ষ্য নরেশ চন্দ্র নহেন, আর কেহ। কিন্তু সেই 'আর কেহ'রও সব বই তাঁহার পড়িয়া দেখা উচিত বলিয়া মনে করি।"

সকলের সব বই পড়া বা না-পড়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়; সব বই পড়েই মতামত দেওয়া সঙ্গত, কিন্তু খুব কম লোকেই তা দেয়। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য পড়তে একজনের সারা জীবনই লেগে যেতে পারে; শরৎ-সাহিত্য সমগ্রভাবে উপলব্ধি করা ও সামগ্রিক অভিমত প্রকাশও কঠিন। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্য পড়ার সময় পান না বা পড়েন না একথা যেমন সর্বাংশে সত্য নয়, অচিন্ত্য সেন ও বুদ্ধদেবের সমগ্র রচনা পড়ে যথাক্রমে 'বেদে' ও 'বাসর ঘর' সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন এও সত্য হ'তে পারে না। একটা বইয়ের ওপর লেখক সম্পর্কে মন্তব্য করা যায়, কিন্তু সর্বদা নিরাপদ নয়।

তবে নবীন সাহিত্যব্রতীদের পক্ষে শরৎচন্দ্রের এই প্রতিবাদ খুবই সঙ্গত যে, "ইঁহাদের বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড অভিযান সুরু হইয়াছে। ক্ষমা নাই, ধৈর্য নাই, বন্ধুভাবে সংশোধনের বাসনা নাই, আছে শুধু কটূক্তি, আছে শুধু সুতীব্র বাক্যশেলে ইহাদের বিদ্ধ করিবার সঙ্কল্প।"

গুরুর আসন

শরৎচন্দ্র সর্বশেষে আক্ষেপ ক'রে বলেছেন, "ভাগ্যদোষে আমার প্রতি তিনি বিরূপ, আমার কথা হয়ত তিনি বিশ্বাস করিবেন না, কিন্তু তাঁহাকে সত্যই নিবেদন করিতেছি যে, বাঙলা সাহিত্য-সেবীদের মাঝে এমন কেহই নাই যে, তাঁহাকে মনে মনে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে নাই। আধুনিক সাহিত্যের অমঙ্গল আশঙ্কায় যাহারা কানের কাছে 'গুরুদেব' বলিয়া অহরহ বিলাপ করিতেছে, তাহাদের কাহারও চেয়েই ইহারা রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধায় খাটো নহে।"

প্রবন্ধটি ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গবাণী'র আশ্বিন সংখ্যায় বেরিয়েছিল। এটি পড়বার আগে রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য ধর্ম্ম' প্রবন্ধটি পড়া সঙ্গত এই কারণে যে. শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের অনেক শব্দ ও উক্তি মিশে আছে যাব প্রয়োগ ও প্রাসঙ্গিকতা অন্যথা বোঝা সম্ভব নয়। যেমন—"কিন্তু এ প্রশ্নই অবৈধ"; 'চিৎপুর রোডের খচো-খচো-খচ্‌কার যোগে এক ঘেয়ে পদের পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত গর্জন"; "সাইকো-এনালিসিস"; কি কি ফুল কাব্যে চলে এবং কি কি ফুলের রান্নাঘরে জাত মারা গেছে; "পৃথিবী সূর্য্যের চারিপাশে ঘোরে; রাজার পুত্র গেলেন…ইত্যাদি; কোটাল পুত্রের ডিটেকটিভ বুদ্ধি……ইত্যাদি; সওদাগর পুত্রের বেনেবুদ্ধি…ইত্যাদি; কাঁকর-পদ্মের উদাহরণ; বিদেশের আমদানি।

'রস-সেবায়েত'

'রস-সেবায়েত' আর একটি অনুরূপ লেখা: লেখা নয়, চিঠি—শ্রীযুক্ত 'আত্মশক্তি'-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

১৩৩৪ বঙ্গাব্দে ৩০এ ভাদ্রের 'আত্মশক্তি'তে এক মুসাফির লিখিত 'সাহিত্যের মামলা' প্রসঙ্গে, রস-সেবায়েত-নামা চিঠিটি 'আত্মশক্তি'র ১৩ই আশ্বিন সংখ্যায় বেরোয়। লেখেন ৫ই আশ্বিন। তিনি লিখেছেন:

"মুসাফির-রচিত এই 'সাহিত্যের মামলার' অধিকাংশ মন্তব্যের সহিতই আমি একমত, শুধু তাঁহার একটি কথায় যৎকিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। রবীন্দ্রনাথের ব্যাপার রবীন্দ্রনাথ জানেন, কিন্তু আমার নিজের কথা যতটা জানি তাহাতে শরৎচন্দ্র 'কল্লোল' 'কালি কলম' বা বাঙলার কোন কাগজই পড়েন না বা পড়িবার সময় পান না, মুসাফিরের এই অনুমানটি নির্ভুল নয়।…কিন্তু যা লইয়া বিবাদ বাধিয়াছে সে জিনিসটি যে কি, এবং যুদ্ধ করিয়া যে কিরূপে তাহার মীমাংসা হইবে সে আমার বুদ্ধির অতীত।

"রবীন্দ্রনাথ দিলেন সাহিত্যের ধর্ম নিরূপণ করিয়া, এবং নরেশ দিলেন সেই ধর্মের সীমানা নির্দেশ করিয়া।…ভাবিলাম, ব্যস্, ইহার পরে আর কথা চলিবে না। কিন্তু…চলিল। আশ্বিনের 'বিচিত্রা'য় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী 'সীমানা বিচারের' রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ঠাসবুনানি বিশ-পৃষ্ঠাব্যাপী ব্যাপার।…ডাইনে ও বামে রবীন্দ্রনাথ ও নরেশচন্দ্রকে লইয়া অক্লান্তকর্মী-দ্বিজেন্দ্রনাথ নিরপেক্ষ সমান-ভাবে তুলাধুনা করিয়াছেন।"

এতে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ ঐ পর্যন্তই ; কিন্তু 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত এক ব্রজদুর্লভ হাজরার 'রস ও রুচি' সম্পর্কে একটি লেখায় আধুনিক লেখকদের উদ্দেশে নির্দয় কটাক্ষের তীব্র প্রতিবাদে সঙ্গত ক্রোধ প্রকাশ করেছেন শরৎচন্দ্র : "লোকটি জানেও না যে, দারিদ্র অপরাধ নয়, এবং সর্বদেশে ও সর্বকালে ইহারা অনশনে প্রাণ দিয়াছে বলিয়াই সাহিত্যের আজ এত গৌরব। (২৪)

রবীন্দ্রনাথের চরকা

শরৎচন্দ্র 'নূতন প্রোগ্রাম' নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই ইংরাজি উদ্ধৃতি দিয়েছেন : "The programme of the charka is so utterly childish that it makes one despair to see the whole country deluded by it". তারপর বলেছেন, সেদিন কেন যে কবি এতবড় দুঃখ করিয়াছিলেন, আজ তাহার কারণ বুঝা যায়। কিন্তু এখনও এ মোহ সকলের কাটে নাই,—প্রায় তেমনি অক্ষয় হইয়াই আছে, তাহারও বহু নিদর্শন বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় দেখা যায়।...কারণ, ব্যক্তিগত ভক্তি অন্ধ হইয়া গেলে কোথাও তাহার আর সীমা থাকে না। এই ব'লে তিনি এক খদ্দরের আড়তদারের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—যিনি আশ্রম তৈরি করে ছাগ-দুগ্ধপান, টিকি ধারণ, গুরুর অনুকরণে কাপড় পরণ, তেমনি উপবেশন, চাদরে অঙ্গাবরণ, তেমনি মৃদুভাষণ, অভ্যাস করছেন, এমন কি, সুমুখের দন্তোৎপাটনে সমরূপ হ'তে প্রস্তুত।"* এই প্রবন্ধে আরও আছে :

"অনিলবরণ বলেন, কোথায় চরকা, কোথায় তুলো, কোথায় ধুনুরি, এত হাঙ্গামা না করিয়া অবসরমত দু'মুঠা ঘাস ছিঁড়িলেও ত' মাসিক দশ আনা বারো আনা অর্থাৎ দিন এক পয়সা দেড় পয়সা রোজগার হয়।... আমি বলি, অনিলবরণের প্রস্তাবটিকে due consideration দেওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরিয়াছেন, তিনি হয়ত শুনিয়া বলিবেন, ইহাও utterly childish, কিন্তু আমরা বলিব, কবিদের বুদ্ধি-সুদ্ধি নাই,......বিশেষতঃ বার মাসের মধ্যে তের মাস থাকেন তিনি বিলাতে, দেশের আবহাওয়া তিনি জানেন কতটুকু?" (২৫)

(২৪) শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ ; নবম সম্ভার, পৃপৃঃ ৪০৫-৭।

* অনুমান করা যায় কে তিনি, নামোল্লেখ বাহুল্য, বিশেষ তিনি জীবিত।

(২৫) শঃ সাঃ সঃ, ১০ সঃ ১ পৃঃ ৩৫১।

এটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রের কথা ; সাহিত্যক্ষেত্রেও কিছু মতান্তর ছিল ; তা আমরা 'সাহিত্যধর্ম' নিয়ে আলোচনাকালে দেখেছি। দেখা যাচ্ছে, ১৩৩৬ এ বা ১৯২৯-এ ৫৪তম জন্মদিনে প্রেসিডেন্সি কলেজে বঙ্কিম-শরৎ সমিতির সভ্যগণের অভিনন্দনের উত্তরে তিনি যে ভাষণ দেন, তাতে ঐ মতান্তরের জের চলেছে। শরৎচন্দ্র বলছেন। "অনেক দিন পূর্ব্বে, বোধ হয় আপনাদের মনে আছে পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁর মতামত প্রকাশ করেচেন। একটু কঠোর ভাবে তিনি তা প্রকাশ করেছিলেন। ঠিক তার প্রতিবাদে নয়, কিন্তু সবিনয়ে আমি 'বঙ্গবাণীতে' তাঁকে আমি জানিয়েচি, যতটা রাগ ক'রে তিনি বলেচেন, ততটাই সত্য কি না? তারপর থেকে দু-একজনের মুখে যখন শুনলাম, ওটা বলা আমার ঠিক হয় নাই, তখন থেকে নবীন সাহিত্য, যা আজকালকার খবরের কাগজে, মাসিক পত্রে ও নানাভাবে অনবরত বেরুচ্ছে—গত এক বৎসর আমি সে-সকল যথেষ্ট মন দিয়ে পড়েচি। আমার সমালোচনার হয়ত বিশেষ কোন মূল্য নেই, কারণ, আমি সমালোচনা করতেই পারি না। শুধু ভাল-মন্দ লাগার ভিতর দিয়ে আমার নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারি।"

সাহিত্যাঙ্গনে আবার কাছাকাছি

লক্ষ্যণীয় যে, শরৎচন্দ্র এক বছর আধুনিক সাহিত্য পড়ে রবীন্দ্রনাথের সেকালে ব্যক্ত অভিমতের কাছাকাছি এসে পড়েছেন। তিনি বলেছেন, "আজকে আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে—জিনিসটা সত্যই বিশ্রী হয়ে উঠেচে। আমি বরাবর চেয়েছিলাম, কবিরা যাকে রসবস্তু বলেন, এইটিই যেন তাঁরা তাঁদের যৌবনের শক্তি, অভিজ্ঞতা, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি নিয়ে সাহিত্য গড়ে তুলতে পারেন। আমি তাঁদের ভালবাসি এবং এই দিক থেকেই তাঁদের উৎসাহ বরাবর দিয়ে এসেচি।...কিন্তু এক বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে আমার মন ঠিক অন্যরকম হয়ে গেছে। আমি দেখচি, আমি যাকে রস বলে বুঝি, তাদের ভিতর তার বড্ড অভাব।

"দু'-তিনজন বন্ধু দেখা করতে এসেছিলেন, তাঁ-দিগকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা এটা করচ কেন? উত্তরে তাঁরা বললেন—এই জন্য করচি, আমাদের আর scope নাই।...আমি বললাম—কেবল একটা ব্যাপারে তোমরা বেদনা বোধ করচ।...বেদনার কি আর কোন বস্তু দেখতে পাওনা? মানব-জীবন, সমস্ত সংসার, এত বড় পরাধীন জাতি, এসব ত রয়েচে, এর বেদনা

কি তোমরা অনুভব কর না? আমরা সব চাইতে দরিদ্র, আমাদের মধ্যে শিক্ষার কত অভাব, সামাজিক ব্যাপারে কত ত্রুটি আছে—এসব নিয়ে তোমরা কাজ কর না কেন?...যেটাকে তোমরা সাহস মনে করচ, আমি মনে করি, সেটা সাহসের অভাব।...যেদিকে শাস্তির ভয় আছে, সেখানে সত্য-সত্যই সাহসের দরকার। সেখানে তোমরা নীরব। পরাধীন দেশে কতরকম অভাব আছে—নানান্ দিক আছে—এটা যেন তোমরা দেখতেই পাওনা।...এদিকটাকে অস্বীকার ক'রো না। অন্যান্য দেশের দু'চারখানা বই পড়েচি, তাতে দেখেচি, এ জিনিসে তারা কখনও চোখ বুজে থাকেনি। এর জন্য তারা অনেক সহ্য করেচে, অনেক শাস্তি ভোগ করেচে।...

"রবীন্দ্রনাথ যত কড়া কথা বলচেন, তেমন করে বলবার শক্তি আমার নেই, থাকলে হয়ত তেমন করে বলতাম। সত্যই খারাপ হচ্ছে। এখন তাদের সংযত হওয়া দরকার! আর রসবস্তু যে কি, বাস্তবিক কি হলে মানুষ আনন্দ বোধ করে, মানুষ বড় হয়, তার হৃদয়ের প্রসার বাড়ে—এ সব চিন্তা করা দরকার, ভাবা দরকার। আমি গল্প লেখার দিক থেকে বলচি, কাবতার াদক থেকে নয়। সংবাদ পত্র—মাসিক—যখন পড়ি, কেবলই যেন মনে হয়, একই কথার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।...গত একবৎসর তাঁদের বহু রচনা পড়ে তাঁদের কিছু বলবার সুযোগটাই খুঁজছিলাম। সেই সুযোগ আজ পেয়েছি। আমি বলি, তাঁরা সংযত হউন।...তোমরা জানো, তরুণদের আমি বাস্তবিক ভালবাসি। তাদের সমস্ত চেষ্টায় আমি থাকি। এই মাত্র যুব সমিতির মিটিং ক'রে এলাম। যথার্থ বন্ধুভাবে আমি তাঁদের বলচি—তাঁরা সংযমের সীমা অনেকখানি উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। আজ রবীন্দ্রনাথের সেই কঠোর কথাটাই আমার বারংবার মনে পড়ে। সেদিন অনেকেই মনে করলেন যেন আমি তাঁর কথার পাল্টা উত্তর দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তা করিনি, কোন দিন করব বলে মনেও করি না। সেদিন তাঁর কথা আমার অতটা না বললেও হয়ত হ'তো। কারণ, এতখানি বোধ করি অত্যন্ত কঠোর ঠেকেছিল। মনে হয়েছিল, সত্য ছিল না। কিন্তু এক বৎসর পরে এ আর আমি বলতে পারিনা।

"আজ মনে হয়, যতই এঁদের বিরুদ্ধে-কথা উঠচে, ততই যেন এঁদের আক্রোশ বেড়ে চলেচে।...মনে হয়, যেন তাঁরা বলচেন—বেশ করেচি, আরও করব।

"...বহুদিন সাহিত্য-চর্চ্চা করে যা ভাল বুঝেছি, তার থেকেই বলচি...

তোমরা সীমা অতিক্রম করেচ—একটু-আধটু করেচ তা নয়, অনেকখানি করেচ।…যদি তোমরা কেউ বলো—আমিও ত এটা লিখেচি, রবীন্দ্রনাথও অমন লিখেচেন—হতে পারে, আমরা লিখেচি। তাতে কিন্তু প্রমাণ হয় না যে, তোমরা ভাল কাজ করেচ।"(২৪)

বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে তিনি সর্বদাই শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচার করেছেন। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে বা ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে লাহোর-প্রবাসী বাঙালীদের দেওয়া অভিনন্দনের উত্তরে একথাটি বলতে ভোলেন নি ঃ "ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি,—সত্যই প্রার্থনা করুন যেন এত বড় ভাষাকে,—যাকে রবীন্দ্রনাথ এত বড় ক'রে তুললেন, তাকে যেন আরও বড় করা হয়। (২৫)

অপ্রত্যাশিত পুরস্কার

১৩৩৭ বঙ্গাব্দে বা ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্রের ৫৫তম জন্মদিনে প্রেসিডেন্সি কলেজে বঙ্কিম-শরৎ সমিতির অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলেন ঃ "শুনেচি, সমিতির প্রার্থনায় কবিগুরু একটুখানি লিখন পাঠিয়েছিলেন, Liberty-তে তার ইংরেজী তর্জ্জমা প্রকাশিত হয়েচে। তার শেষের দিকে আমার অকিঞ্চিৎকর সাহিত্য-সেবার অপ্রত্যাশিত পুরস্কার আছে। এ আমার সম্পদ। তাঁকে নমস্কার জানাই, এবং সমিতির হাত দিয়ে একে পেলাম বলে আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

"এই লেখাটুকুর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বাঙলার কথা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের একটুখানি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েচেন। বিস্তারিত বিবরণও নয়, দোষ-গুণের সমালোচনাও নয়, কিন্তু এরই মধ্যে চিন্তা করার আলোচনা করার, বাঙলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ দিক্ নির্ণয়ের পর্য্যাপ্ত উপাদান নিহিত আছে। কবি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র উল্লেখ করে বলেচেন, 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র তুলনায় এর সাহিত্যিক মূল্য সামান্যই। এর মূল্য স্বদেশ-হিতৈষণায়,—মাতৃভূমির দুঃখ দুর্দ্দশার বিবরণে, তার প্রতিকারের উপায় প্রচারে, তার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি আকর্ষণে। অর্থাৎ, 'আনন্দমঠে' সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের সিংহাসন জুড়ে বসেচে প্রচারক ও শিক্ষক বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্বন্ধে এমন কথা বোধ করি এর পূর্ব্বে আর কেউ বলতে সাহস করে নি। এবং একথাও হয়ত নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, কথা-সাহিত্যের ব্যাপারে এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত অভিমত।…

(২৪) শঃ সাঃ সঃ,১২ সম্ভার, পৃপৃঃ ৩৪৫-৪৮।
(২৫) শঃ সাঃ সঃ, ১২ সঃ, পৃঃ ৩৩৫।

এ উক্তি রবীন্দ্রনাথের—যাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা ও instinct প্রায় অপরিমেয় বলা চলে।”

বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্র কালক্রমে অভিজ্ঞতালাভে এই সত্যটি উপলব্ধি করেছেন। শিক্ষার মিলন নিয়ে বিরোধ বা আধুনিক সাহিত্যিকদের পক্ষ নিয়ে ওকালতি অথবা ‘পথের দাবী’ নিয়ে অভিমান করবার দিন তাঁর আর নেই। এখন তিনি বুঝতে পেরেছেন, তাঁর বিরোধে নয় রবীন্দ্রনাথের মিলনের মধ্যে একটা শাশ্বত সত্যের ইঙ্গিত ছিল এবং ঐ চিরন্তনীর দৃষ্টিতেই তথাকথিত আধুনিক সাহিত্য তাঁর কাছে অশ্রদ্ধেয় হ’য়ে গেছে। তেমনি সাহিত্য সৃষ্টি ও প্রচার ধর্ম দুটি পৃথক বৃত্তি এবং একই মানুষের মধ্যে থাকলেও থাকতে পারে ও এজন্যেই একই সাহিত্যিকের সমগ্র সৃষ্টি এইভাবে বিশ্লিষ্ট করা সম্ভব। কেন এই দ্বৈতরূপ ?

স্বদেশ ও সাহিত্য

শরৎচন্দ্র বলেছেন, “গল্প, উপন্যাস ও কবিতায় স্বদেশের দুঃখের কাহিনী, অনাচার অত্যাচারের কাহিনী কি ক’রে যে লেখকের অন্যান্য রচনা ছায়াচ্ছন্ন ক’রে দেয়, আমি নিজেই তা জানি, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি সভায় গিয়েও তা অনুভব করে এসেচি। বছর কয়েক পূর্বে কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম সাহিত্য-সভায় একবার উপস্থিত হতে পেরেছিলাম। দেখলাম, তাঁর মৃত্যুর দিন স্মরণ ক’রে বহু মনীষী, বহু পণ্ডিত, বহু সাহিত্য-রসিক বহু স্থান থেকে সভায় সমাগত হয়েচেন, বক্তার পরে বক্তা—সকলের মুখেই ঐ এক কথা,—বঙ্কিম ‘বন্দে মাতরম্’ মন্ত্রের ঋষি, বঙ্কিম মুক্তিযজ্ঞে প্রথম পুরোহিত। সকলের সমবেত শ্রদ্ধাঞ্জলি গিয়ে পড়ল একা ‘আনন্দমঠে’র ’পরে। ‘দেবী চৌধুরানী’, ‘কৃষ্ণচরিতে’র উল্লেখ কেউ কেউ করলেন বটে, কিন্তু কেউ নাম করলেন না ‘বিষবৃক্ষে’র, কেউ স্মরণ করলেন না ‘কৃষ্ণকান্তের উইলকে।

।“কিন্তু একটা কথা রবীন্দ্রনাথ বলেন নি। বঙ্কিমের ন্যায় অত বড় সাহিত্যিক প্রতিভা, যিনি তখনকার দিনেরও বাঙলা ভাষার নবরূপ, নবকলেবর সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, ‘বিষবৃক্ষ’ ও ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’—বঙ্গ সাহিত্যের মহামূল্য সম্পদ দুটি যিনি বাঙালীকে দান করতে পেরেছিলেন, কিসের জন্য তিনি পরিণত বয়সে কথা-সাহিত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন ক’রে আবার ‘আনন্দমঠ’, ‘দেবী চৌধুরানী’, ‘সীতারাম’ লিখতে গেলেন ? কোন্ প্রয়োজন তাঁর হয়েছিল ? কারণ, একথা তো নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রবন্ধের মধ্যে

স্বকীয় মত প্রচার তাঁর কাছে কঠিন ছিল না। আশা আছে, রবীন্দ্রনাথ হয়ত কোনোদিন এ সমস্যার মীমাংসা ক'রে দেবেন। আজ সকল কথা তাঁর বুঝিনি, কিন্তু সেদিন হয়ত আমার নিজের সংশয়ের মীমাংসাও এর মধ্যেই খুঁজে পাবো।

উপসংহারে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সেদিনকার 'সাহিত্য ধর্মের'ই প্রতিধ্বনি ক'রে বলেছেন : আধুনিক সাহিত্য-বিচারেও এই সত্যটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাহিত্য-রচনায় আর যাই কেন-না হোক, শ্লীলতা, শোভনতা, ভদ্র রুচি ও মার্জ্জিত মনের রসোপলব্ধিকে অকারণ দাম্ভিকতায় বারংবার আঘাত করতে থাকলে বাঙলা-সাহিত্যের যত ক্ষতিই হোক, তাঁদের নিজেদের ক্ষতি হবে তার চেয়েও অনেক বেশী। তা আত্মহত্যারই নামান্তর। (২৬)

রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে সভা-নায়ক

১৩৩৮ বঙ্গাব্দে অথবা ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে 'রবীন্দ্র জয়ন্তী'র সভা-নায়করূপে শরৎচন্দ্র তাঁর ভাষণ পড়লেন :

"কবির জীবনের সপ্ততি বৎসর পূর্ণ হোলো। বিধাতার এই আশীর্বাদ শুধু আমাদিগকে নয়, সমস্ত মানবজাতিকে ধন্য করেচে।...কবির শুধু কাব্যেই নয়, তাঁকে আমরা চোখে দেখেচি, তাঁর কথা কানে শুনেচি, তাঁর আসনের চারিধারে ঘিরে বসবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটেচে।...

"আমি জানি বিতর্কের স্থান এ নয়, সাহিত্যের ভালো-মন্দ বিচার, এর জাতি-কুল নির্ণয়ের সমস্যা নিয়ে এ পরিষৎ আহূত হয়নি,—তার প্রয়োজন যথাস্থানে—আমরা সমবেত হয়েচি বৃদ্ধ কবিকে শ্রদ্ধার অর্ঘ নিবেদন করে দিতে। তাঁকে সহজ ভাবে বলতে—কবি, তুমি অনেক দিয়েচো, এই দীর্ঘকাল তোমার কাছে আমরা অনেক পেয়েচি। সুন্দর, সবল, সর্বসিদ্ধিদায়িনী ভাষা দিয়েচো তুমি, তুমি দিয়েচো বিচিত্র ছন্দোবদ্ধ কাব্য, দিয়েচো অনুরূপ সাহিত্য, দিয়েচো জগতের কাছে বাঙলার ভাষা ও ভাব-সম্পদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়, আর দিয়েচো যা সকলের বড়—আমাদের মনকে দিয়েচো বড় করে। তোমার সৃষ্টির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার আমার সাধ্যাতীত—এ আমার ধর্মবিরুদ্ধ।

"যে পরিবারে আমি মানুষ, সেখানে কাব্য উপন্যাস দুর্নীতির নামান্তর, সঙ্গীত অস্পৃশ্য।...আমার এক আত্মীয় তখন বিদেশে, তিনি এলেন বাড়ী

(২৬) শঃ সাঃ সঃ, ১২ সঃ, পৃপৃঃ ৩৪৯-৫১

তাঁর ছিল সঙ্গীতে অনুরাগ, কাব্যে আসক্তি; বাড়ীর মেয়েদের জড় করে তিনি একদিন পড়ে শোনালেন রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'। কে কতটা বুঝলে জানিনে, কিন্তু যিনি পড়ছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার চোখেও জল এলো।"

এখানে শরৎচন্দ্রের একটি অকপট স্বীকারোক্তি আছে যা শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবনের রচনার ওপর আলোকপাত করে :

"খবর পেলাম বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর।...পড়ে পড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হয়ে গেল। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেচি যে নয়। লেখার দিক দিয়ে সেগুলো একেবারে ব্যর্থ হয়েচে, কিন্তু চেষ্টার দিক দিয়ে তার সঞ্চয় মনের মধ্যে আজও অনুভব করি।

চোখের বালি

'তারপর এলো 'বঙ্গদর্শনে'র নবপর্য্যায়ের যুগ। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' তখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্চে। ভাষা প্রকাশ ভঙ্গীর একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়লো। সেদিনের সেই গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোনদিন ভুলবো না। কোন কিছু যে এমন করে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে চায়, এর পূর্বে কখন স্বপ্নেও ভাবিনি। এতদিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম। অনেক পড়লেই যে তবে অনেক পাওয়া যায়, এ-কথা সত্য নয়। ওই তো খানকয়েক পাতা, তার মধ্য দিয়ে যিনি এত বড় সম্পদ সেদিন আমাদের হাতে পৌঁছে দিলেন, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া যাবে কোথায়?"

শরৎচন্দ্রের এই উক্তি রবীন্দ্রনাথেরই এমনিতর কিছু কথা মনে করিয়ে দেয় —তা বঙ্গদর্শন ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-স্মৃতিতে লিখেছেন : "অবশেষে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল। একে তো তাহার জন্য মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহার পরে বড়োদলের পড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করা আরও বেশি দুঃসহ হ'ত। 'বিষবৃক্ষ,' 'চন্দ্রশেখর,' এখন যে-খুশি সেই অনায়াসে একেবারে এক গ্রাসে পড়িয়া ফেলিতে পারে কিন্তু আমরা যেমন করিয়া মাসে পর মাস, কামনা করিয়া, অপেক্ষা করিয়া, অল্পকালের পড়াকে সুদীর্ঘকালের অবকাশের দ্বারা মনের মধ্যে অনুরণিত করিয়া—তৃপ্তির সঙ্গে

অতৃপ্তি, ভোগের সঙ্গে কৌতূহলকে অনেকদিন ধরিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া পড়িতে পাইয়াছি, তেমন করিয়া পড়িবার সুযোগ আর কেহ পাইবে না।'(২৭)

দুই কালের সন্ধিস্থলে

"পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি—কোথায় গেল 'বিজয় বসন্ত,' সেই 'গোলেবকাওলি,' সেই বালক-ভুলানো-কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য! বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মতো 'সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ'। এবং মুষল-ধারে ভাববর্ষণে বঙ্গ-সাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিম বাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল।...

"মাতৃভাষার বন্ধ্যদশা ঘুচাইয়া যিনি তাহাকে এমন গৌরবশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন তিনি বাঙালির যে কী মহৎ কী চিরস্থায়ী উপকার করিয়াছেন সে কথা যদি কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয় তবে তদপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই।" (২৮)

শরৎচন্দ্র বলেছেন, "এর পরেই (অর্থাৎ বঙ্গদর্শনের নবপর্যায়ে 'চোখের বালি' পড়ার পর) সাহিত্যের সঙ্গে হোলো আমার ছাড়াছাড়ি।...দীর্ঘকাল কাটলো প্রবাসে,—ইতিমধ্যে কবিকে কেন্দ্র করে কি করে যে নবীন বাংলা সাহিত্য দ্রুতবেগে সমৃদ্ধিতে ভরে উঠলো, আমিই তার কোনও খবর জানি নে। কবির সঙ্গে কোনও দিন ঘনিষ্ঠ হবারও সৌভাগ্য ঘটে নি, তাঁর কাছে বসে সাহিত্যের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাইনি, আমি ছিলাম একেবারেই বিচ্ছিন্ন।......সেই বিদেশে আমার সঙ্গে ছিল কবির খানকয়েক বই—কাব্য ও কথাসাহিত্য এবং মনের মধ্যে পরম শ্রদ্ধা বিশ্বাস। তখন ঘুরে ঘুরে ঐ ক'খানা বই-ই বার বার করে পড়েছি,—কি তার ছন্দ, কটা তার অক্ষর, কাকে বলে art, কি তার সংজ্ঞা, ওজন মিলিয়ে কোনও ত্রুটি ঘটেচে কিনা—এসব বড় কথা কখনো চিন্তাও করিনি—ও-সব ছিল আমার কাছে বাহুল্য। শুধু সুদৃঢ় প্রত্যয়ের আকারে মনের মধ্যে

(২৭) রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ খণ্ড, পৃঃ ৫৫

(২৮) 'বঙ্কিমচন্দ্র,' রঃ রঃ, ১৩ খণ্ড, পৃঃ ৮৯১।

এইটুকু ছিল যে, এর চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর কিছুই হতে পারে না। কি কাব্যে, কি কথা-সাহিত্যে, আমার ছিল এই পুঁজি।……আর কোথাও না হোক, সাহিত্যে গুরুবাদ আমি মানি।

"রবীন্দ্র-সাহিত্যের ব্যাখ্যা করতে আমি পারিনে, কিন্তু ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ওর অন্তরের সন্ধান আমাকে দিয়েচে।"

শরৎচন্দ্র আবার বললেনঃ "জানি রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনায় এ-সকল অবান্তর, হয়তো বা অর্থহীন, কিন্তু গোড়াতেই আমি বলেচি যে, আলোচনার জন্য আমি আসিনি, এর সহস্র ধারায় প্রবাহিত সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্যের বিবরণ দেওয়াও আমার সাধ্যতীত, আমি এসেছিলাম শুধু আমার ব্যক্তিগত গোটাকয়েক কথা এই জয়ন্তী-উৎসব সভায় নিবেদন করে দিতে।"(২৯)

"মানুষ রবীন্দ্রনাথ"

রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্য সম্পর্কে কোন অভিমত প্রকাশ করেছেন তখন শরৎচন্দ্র কোথাও কোথাও অমত প্রকাশ করেছেন। লক্ষ্যণীয়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে কোথাও কখনো রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন নি। সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের রচনা বিস্তর। বোঝা যায়, সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মন কিভাবে অহর্নিশি আলোড়িত হ'ত। সেগুলো সাহিত্যিকের পথনির্দেশ হিসেবেও অনন্য। এদিক থেকে সমগ্র শরৎ-সাহিত্যে একটা অভাব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কিন্তু এই ব্যাপারে শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন এবং কখনও এ নিয়ে অহেতুক আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করেন নি। এখানে তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি আছে। এবং তিনি বলছেন, "মানুষ রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আমি সামান্যই এসেচি। কবির কাছে একদিন গিয়েছিলাম বাঙলা-সাহিত্যে সমালোচনার ধারা প্রবর্তিত করার প্রস্তাব নিয়ে। নানা কারণে কবি স্বীকার করতে পারেন নি, তার একটা হেতু দিয়েছিলেন যে, যার প্রশংসা করতে তিনি অপারগ, তার নিন্দে করতেও তিনি তেমনি অক্ষম। আরও বলেছিলেন যে, তোমরা যদি এ-কাজ কর, কখনো ভুলো না যে, অক্ষমতা ও অপরাধ এক বস্তু নয়। ভাবি, সাহিত্য-বিচারে এই সত্যটা যদি সবাই মনে রাখতো!"

এই ভাষণটিতে কবির প্রতি শরৎচন্দ্রের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা প্রকাশে পেয়েছে.

(২৯) শঃ সাঃ সঃ, ১২ সম্ভার, পৃঃ ৩৩২

বিরূপ কোন মন্তব্যই নেই। আবার, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্পর্কে প্রত্যাশিত শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক মতামতও অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ যখন কোন সাহিত্যিকের সৃষ্টি বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করেছেন তখন তাতেও তাঁর বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা প্রতিভাত হয়েছে, তা নিজগুণে সাহিত্য হয়ে উঠেছে।

'গলায় মালা দিলে'

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২৮এ পৌষ, ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি শরৎচন্দ্র এই রবীন্দ্রজয়ন্তী প্রসঙ্গে লিখলেন শ্রীঅমল হোমকেঃ সত্যি অমল, আমি যে কতখানি খুশী হয়ে এসেছি, সে তোমরা (না তুমি ?) টাউন হলে সভাপতির আসনে আমাকে টেনে বসালে, আমার গলায় মালা দিলে বলে নয়,—আমার লেখা মানপত্র কবির হাতে দিলে বলেও নয়—যেভাবে এই বিরাট ব্যাপারটি সম্পন্ন হ'ল, এই অনুষ্ঠানটিকে যে নিষ্ঠায়, শ্রমে ও শ্রদ্ধায় সার্থক ক'রে তুললে,—তাতেই আমার আনন্দ, অকপট আনন্দ। কবির সম্বন্ধে আমি এখানে ওখানে কখনো কখনো মন্দ কথা বলেছি, রাগের মাথায়—এ যেমন সত্যি—এও তেমনি সত্যি যে, আমার চাইতে তাঁর বড় ভক্ত কেউ নেই,—আমার চাইতে তাঁকে কেউ বেশী মানেনি গুরু বলে,—আমার চাইতে কেউ বেশী মক্‌সো করেনি তাঁর লেখা। তাঁর কবিতার কথা বলতে পারবো না, কিন্তু আমার চাইতে বেশী বার কেউ পড়েনি তাঁর উপন্যাস,—তাঁর চোখের বালি, তাঁর গোরা, তাঁর গল্পগুচ্ছ। আজকের দিনে যে এত লোক আমার লেখা পড়ে ভাল বলে, সে তাঁরি জন্যে। এ সত্য পরম সত্য আমি জানি। আর কেউ বললে কি না বললে, তাতে কিছু এসে যায় না। তাই আমি আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে যোগ দিয়েছি এই জয়ন্তীতে, না দিয়ে পারি নি।"

১৩৩৯ বঙ্গাব্দ বা ১৯৩২ খৃষ্টাব্দটি শরৎচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অতি সুমধুর সম্পর্কের বছর। এই বছর রবীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্য নাটক—"কালের যাত্রা" শরৎচন্দ্রকে সস্নেহ উপহার দেন; 'সাধারণ মেয়ে' কবিতাটিতেও সেই স্নেহের প্রকাশ। শরৎচন্দ্রও রবীন্দ্রনাথকে "বিজয়ার শত কোটী প্রণাম" জানান।

'সাধারণ মেয়ে'

'আমি অন্তঃপুরের মেয়ে,
চিনবে না আমাকে।
তোমার শেষ গল্পের বইটি পড়েছি, শরৎবাবু,
'বাসি ফুলের মালা।'
তোমার নায়িকা এলোকেশীর মরণ-দশা ধরেছিল
পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে।
পঁচিশ বছর বয়সের সঙ্গে ছিল তার রেষারেষি,
দেখলেম তুমি মহদাশয় বটে,
জিতিয়ে দিলে তাকে।

* * *

তোমাকে দোহাই দিই।
একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখ তুমি।
বড়ো দুঃখ তার।

* * *

বুঝে নিয়েছি আমার কপাল ভেঙেছে,
হার হয়েছে আমার।
কিন্তু তুমি যার কথা লিখবে,
তাকে জিতিয়ে দিয়ো আমার হ'য়ে"......৩০

এটি "কালের যাত্রা"র আগে লেখা; ২৯ এ শ্রাবণ। কালের যাত্রা —৩১ এ ভাদ্র।

'কালের যাত্রা'

নবীন যুগের শরৎ-প্রতিভার স্বীকৃতি চিহ্ন এই স্নেহের উপহার। সেকালের সমাজের জীর্ণতা, পঙ্গুতা ও প্রতিবন্ধকতার বেদনা, পতিত, স্খলিত, পদানতের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি শরৎ-সাহিত্যকে দিয়েছে এক স্বকীয়তা; সেই সাহিত্য স্রষ্টার কাছে কালের ইঙ্গিত রাখলেন কবি।

'কালের যাত্রা'-র উৎসর্গপত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৫৭ বছর বয়সের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে কবির সস্নেহ উপহার। ৩১ ভাদ্র, ১৩৩৯।

---

(৩০) রঃ রঃ, ৩ খণ্ড, পৃপৃঃ ৫৩-৫৬

গদ্য-নাটক উপহার দেবার মধ্যেও এই তাৎপর্য যে, শরৎচন্দ্র কবি নন, গদ্য রাজ্যেই তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। আর, মহাকালের একালটা কি? এই ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ? গান্ধীজীর my life ceases to interest me if I cannot do Harijan's work. অস্পৃশ্যতা মহাপাপ। শরৎচন্দ্রের হৃদয়বত্তার পরিচয় তিনি পেয়েছেন; গান্ধীজীর আবেদন যদি হৃদয়ের কাছে, সে আবেদনে যদি শরৎচন্দ্র ১৯২১ এ ঝাঁপ দিয়ে থাকেন, শরৎ-সাহিত্য যদি সে হৃদয়বত্তারই সাক্ষ্য, তবে কবির কণ্ঠ তাতে মিলে গিয়ে উঠেছে সাবধান-বাণী—মহাকালনাথের জয় চিরসত্য। রথের রশি তার প্রতীক। কাল থেকে কালান্তর, যুগ থেকে যুগান্তর; এক কালে যা সত্য শিব সুন্দর, কালান্তরে তাই অসত্য অশিব অসুন্দর। পুরোহিত জেনেছে তন্ত্রমন্ত্র, মেয়েরা জেনেছে পুরুতের শেখানো পুজো, সংস্কার, সৈনিক জেনেছে তরোয়াল, ধনপতিরা ধন; মহাকালের নিয়মে এদের ভূমিকা গেছে শেষ হয়ে, কালান্তরে এসেছে তাদের ভূমিকা 'যারা কাজ করে' এবং এরাও যেদিন আত্মগরিমায় উঠবে ফুটে, ঘটবে আর এক যুগান্তর।

রবীন্দ্রনাথ মার্ক্সবাদী ছিলেন না; হেগেলের দ্বন্দ্বপ্রগতির (dialectics-এর) অনুসারী ছিলেন না; কিন্তু অনাদি অনন্তকাল পরিব্যাপ্ত মহাকালের এই সত্যকে জেনেছিলেন যে, কালের বিবর্তনে এক একটা সমাজ সমন্বিত হয়, ওতে যখন ঘুণ ধরে তখন তাই হয়ে দাঁড়ায় ওর গতি পথের বাধা, সে আর নড়তে চায় না, নড়তে পারেও না, তখন সমগ্রতার অভ্যন্তর থেকেই আসে প্রবল ধাক্কা, ঘটে যুগান্তর, এমন কি এগোয়, বাধা ঘটলেও সে বাধা অপসারিত হয়। কার্ল মার্ক্স ও এঙ্গেলস একেই বলেছেন ক্লাস ওয়ার, শ্রেণী দ্বন্দ্ব, উৎপাদিকা শক্তি যখন যার হাতে থাকে তার হুকুমেই তৎকালীন সমাজ চলে, কিন্তু তার আভ্যন্তর শক্তি একদিন বেগ পায়, এগোতে গিয়ে সমাজকর্তাদের হাতে পায়ে বাধা পায়। লাগে সঙ্ঘর্ষ, হয় বিপ্লব। জলের মত; তাপে তাপে জল রূপান্তরিত হয় বাষ্পে। ডিমের মত; কুসুম কুড়ে কুড়ে খায় এলবুমিন, হয় মুরগী নয়তো হাঁসের ছানা, ঠোঁট দিয়ে ভাঙে আবরণের বাধা, এক নব আবির্ভাব। কে দেখে এই ভবিষ্যৎ? ঋষি, কবি।

সাবধান বাণী

সমাজের সর্বাঙ্গে যখন বিহ্বলতা, কবিই তখন বারংবার প্রথমে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করতে থাকেন। এখানে কবি এসেছেন প্রথম সন্ন্যাসী, পরে

স্ব-রূপে। সাধারণে বুঝতে পারে না, বিশৃঙ্খলায় পড়ে হাঁফিয়ে। বুঝতে পারে না কি করলে কি হবে; গতানুগতিক পথেই চলতে চায়, কিন্তু দেখে সে-পথেও বাধা জমেছে অনেক; এই অবস্থাটাকেই যারা স্থায়ী করতে চায় তারা কালের রথ টানে পেছন পানে। মেয়েরা জানে সংস্কারের বেদীতে পূজো দিতে, আর সেইভাবেই চায় মহাকালকে তুষ্ট করতে। তাই দড়ি ছেড়ে রাস্তাকে তুষ্ট করতে ছোটে। কিন্তু সন্ন্যাসী বলেন, কালের পথ হয়েছে দুর্গম, তার খানা খন্দ ভবাট করে করতে হবে সমান, তবেই ঘুচবে বিপদ। কোন কোন নাগরিকেরও চৈতন্য হয়, বলে, কালের অপমান করেছি আমরা, তাই ঘটেছে এসব অনাসৃষ্টি। সৈনিকেরাও জানে, চিরদিন আমরা চড়েই এসেছি রথে। চিরদিন রথ টানে ওরা—যাদের নাম করতে নেই। পুরোহিত গেল, ক্ষাত্রশক্তি গেল, ধনিকেরা গেল, কারও সাধ্যি নেই আর রথ চালানোর। একালের রাজত্বে রাজা থাকেন সামনে, পিছনে থাকে বেনে অন্য সব শক্তি আজ অর্থহীন; কিন্তু অর্থবান হাতের পরীক্ষাও ব্যর্থ হয়। মন্ত্রী যখন চরের মুখে শুনলেন গোল বেধেছে শূদ্র পাড়ায়, মন্ত্রী বললেন, নীচের তলাটা হঠাৎ উপরের তলা হয়ে ওঠাকেই বলে প্রলয়, বরাবর যা প্রচ্ছন্ন তাই প্রকাশ হবার সময়টাই যুগান্তর। শূদ্রদের কথা শুনে সৈনিক বলে, সর্বনাশ! এতদিন মাথা হেঁট করে বলে এসেছে ওরা···আজ ধরেছে উল্টো বুলি। মন্ত্রী বললেন, এবার থেকে মান রাখতে হবে ওদের সঙ্গে সমান হয়ে। তারপর অচল রথ চলল ওদেরই টানে, চলল ধনপতিদের ভাণ্ডারের দিকে, আর অস্ত্রশালার দিকে, মানছে না বাপদাদার পথ। কবি বলেছেন, যুগাবসানে লাগেই তো আগুন। যা ছাই হবার তাই ছাই হয়, যা টিঁকে থাকে তাই নিয়ে সৃষ্টি হয় নব যুগের। এতদিনের শিক্ষা (সংস্কার) অকেজো হয়ে পড়ে। কারণ, রথেরদড়ি বাইরে থাকে না, সে থাকে মানুষে মানুষে বাঁধা, দেহে দেহে প্রাণে প্রাণে (মার্ক্সের ভাষায় এরই নাম Production relation), সেখানে অপরাধ জমলে বাঁধন হয় দুর্বল (ঐ হ'য়ে দাঁড়ায় fetters)। কিন্তু দ্বন্দ্ব-প্রগতিতে absolute নেই, শেষ সমাপ্তি বলে কিছু নেই, কোন্ এক-যুগে কোন্ একদিন আসবে উলটো রথের পালা, তখন আবার নূতন যুগের-উঁচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া। কালের যাত্রা চিরন্তন, অব্যাহত তার গতি। কিন্তু সে ভবিষ্যতের কথা। আজকের মতো বলো সবাই মিলে—যারা এতদিন মরে ছিল তারা উঠুক বেঁচে; যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে, তারা দাঁড়াক একবার-মাথা তুলে। ৩১

(৩১) র : র :, ৬ খণ্ড, পৃপৃ : ১০৯১-১১৩৭

কবির অশীর্বাণী

এই ৩১-এ ভাদ্রেই (১৩৩৯) কলকাতার টাউন হলে দেশবাসীর পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্রের যে জন্মজয়ন্তী হয় তাতে পৌরোহিত্য করবার কথা ছিল রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু বিশেষ কাজে আটকে যাওয়ায় নিজে উপস্থিত হ'তে পারেন নি ; এই আশীর্বাণীটি পাঠান ঃ

"কল্যাণীয়েষু—শরৎচন্দ্র,……তোমার বয়স অধিক নয়, তোমার সৃষ্টির ক্ষেত্র এখনো সম্মুখে দীর্ঘ প্রসারিত, তোমার জয়যাত্রার বিরাম হয়নি। সেই অসমাপ্ত যাত্রাপথের মাঝখানে অকস্মাৎ তোমাকে দাঁড় করিয়ে অর্ঘ দেওয়া আমার কাছে মনে হয় অসাময়িক।"

কবি নিজের কথা বললেন ঃ "সত্তর বছর উত্তীর্ণ ক'রে কর্ম সাধনার অন্তিমপর্বে আমি পৌঁচেছি। এই কারণেই অল্পদিন হোলো আমার দেশ আমার জীবনের শেষ প্রাপ্য সমারোহ চুকিয়ে দিয়েছে।…

"সেই দাঁড়ি-টানা সময় তোমার নয়, এখনো দেশকে প্রতিদিন নব নব রচনা বিস্ময়ে নব নব আনন্দ দান করবে এবং সেই উল্লাসে দেশ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ তোমার জয়ধ্বনি করতে থাকবে।…জনসাধারণ সম্মানের যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে তার মধ্যে সমাপ্তির শান্তিবাচন থাকে, তোমার পক্ষে সেটা সঙ্গত নয় এ কথা নিশ্চিন্ত মনে রেখো।"

'কালের যাত্রা'র রবীন্দ্র ব্যাখ্যা

'কালের যাত্রা' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তার উল্লেখ ও মর্ম ব্যাখ্যায় বলছেন ঃ "তোমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে 'কালের যাত্রা' নামক একটি নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। আশা করি, আমার এ দান তোমার অযোগ্য হয়নি। বিষয়টি এই—রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে মহাকালের রথ অচল। মানব সমাজের সকলের চেয়ে বড় দুর্গতি কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানব-সম্বন্ধ অসত্য ও অসম্মান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। সেই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষ ভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে আজ

মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে, তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখে দিকে চলবে।

"কালের রথযাত্রার বাধা দূর করবার মহামন্ত্র তোমার প্রবল লেখনীর মুখে সার্থক হোক এই আশীর্বাদসহ তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

শুভানুধ্যায়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

অনির্বাণ অগ্নি

এ ছাড়া একটি ব্যক্তিগত পত্রও তিনি পাঠান :

"সম্প্রতি সাংসারিক বিশেষ দুর্যোগ না থাকলে আমি নিশ্চয়ই তোমার অভিনন্দন সভায় যোগ দিতুম। এমন কি শারীরিক অস্বাস্থ্য ও দুর্বলতাও বাধা ঘটাত না।

প্রাচীনকালে আর্যদের ঘরে অগ্নিগৃহ থাকত; সেখানে পবিত্র অগ্নিকে যত্ন ক'রে জ্বালিয়ে রাখা হোত, নিবতে দিত না। সাহিত্যে যাঁরা কীর্তিশালী দেশের চিত্তভবনে সেই পুণ্য অগ্নি অনির্বাণ রাখার কাজ তাঁদেরই। তোমার প্রতিভার দ্বারা দেশের হৃদয়কে তুমি জয় করেচ, দেশের গভীর অন্তরে তোমার প্রবেশাধিকার। তোমার লেখনী বাঙালীর চিত্ত-তন্ত্রকে হাসি ও অশ্রুর নবতর ও গভীরতর ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত করে তুলেছে। যেখানে তার মনোমন্দিরে চিরন্তনের পুণ্য বেদিকা, সেইখানে তোমার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যপ্রদীপ বাংলা সাহিত্যের জ্যোতিঃশিখায় দীর্ঘ আয়ুঃ সঞ্চার করবার জন্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে, এই কথা জেনে আমার কর্মাবসানের পশ্চিমদ্বার থেকে তোমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করি ইতি—

৩১শে ভাদ্র, ১৩৩৯।'

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাওড়া থেকে ২৯-এ আশ্বিন, ১৩৩৯, তারিখে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন : শ্রীচরণেষু,—

"আমার বিজয়ার শতকোটী প্রণাম গ্রহণ করিবেন।...

সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার

"কালের যাত্রার সঙ্গে যে আশীর্বাদ আপনার পাইলাম সে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। আপনার তুচ্ছতম দানও জগতের যে কোন সাহিত্যিকের সম্পদ, আমি এ দান মাথায় করিয়া লইলাম।

"আমার ভাগ্য ভালো যে ৩১শে ভাদ্র আপনার কলিকাতায় আসা সম্ভবপর হয় নাই—আসিলে সেদিনের অনাচার দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইতেন। আর সবচেয়ে পরিতাপ এই যে আমার প্রায় সমবয়সী সাহিত্যিক-রাই এই উপদ্রবের সূত্রপাত করিয়াছিল। শুধু এইটুকু সান্ত্বনা যে হয়ত এটাই ইহারা ভালোবাসে—আমি উপলক্ষ মাত্র। কারণ, গত বৎসরের জয়ন্তী উৎসবেও ইহারা কম দুঃখ দিবার চেষ্টা করে নাই।

"আমি একদিন নিজে গিয়া আপনাকে প্রণাম করিয়া আসিতে চাই, শুধু সঙ্কোচে যাইতে পারি না, পাছে কেহ কিছু মনে করে।

"...এই ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া কি করিয়া যে এত বড় শারীরিক পরিশ্রম আপনি করিতে পারেন ইহাই বিস্ময়ের ব্যাপার। ইতি—

সেবক"

নরেন্দ্রদেব তাঁর "সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র"-এ লিখেছেন :

"টাউনহলে তাঁর সপ্তপঞ্চাশৎ জন্মতিথি উপলক্ষে যে বিরাট সংবর্ধনার আয়োজন হয়েছিল, সমস্ত বাংলাদেশ সে অনুষ্ঠানে সানন্দে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু বাঙালীর স্বভাবসিদ্ধ দলাদলি এখানেও সেদিন কুশ্রী মূর্তি নিয়ে দেখা দিয়েছিল। বাংলার রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রাধান্যলাভের জন্য সেদিন দুটি দলের মধ্যে চলছিল ঘোরতর রেষারেষি। একটি ফরওয়ার্ডের দল, অপরটি অ্যাডভান্সের দল। শরৎ বন্দনার জন্য যে কমিটি নির্বাচিত হয়েছিল তার মধ্যে ফরওয়ার্ডের দল পেয়েছিলেন প্রাধান্য, অ্যাডভান্সের দল কমিটির মধ্যে এসেও প্রাধান্যলাভ করতে পারেননি। সাহিত্যিক-শরৎচন্দ্র দলাদলির ঊর্ধে একথা ঘোষণা করা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তিনি সুভাষ বসু ও ফরওয়ার্ড দলের সঙ্গে একটু জড়িয়ে পড়েছিলেন বলে, অপরপক্ষ তাঁর সংবর্ধনায় বিপক্ষদের প্রাধান্যলাভটাকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখতে পারেননি। তাঁরা নিঃশব্দে সংগোপনে ষড়যন্ত্র করে রেখেছিলেন যে, এ আয়োজন পণ্ড করতেই হবে। সুযোগও পেয়ে গেলেন। শরৎচন্দ্রের সপ্তপঞ্চাশৎ জন্মতিথি ৩১শে ভাদ্র, ১৩৩৫ সাল—সেদিনই নাকি হিজলীর বন্দীদ্বয়ের মৃত্যুবার্ষিকী। অতএব রাজনৈতিক 'হিরো ওয়ারশিপে'র জন্য—সাহিত্যরাজ্যের 'হিরো'কে তাঁর পূজামণ্ডপে যাবার পথ ছেড়ে দেওয়া হল না। 'পথের দাবী'র স্রষ্টার পূজা-আয়োজন তারা সেদিন লুটিয়ে দিলে তাই পথের ধুলায়। যাঁদের স্মৃতিকে উপলক্ষ করে এই দক্ষযজ্ঞ ঘটলো তাঁদের আত্মা সেদিন আচার্যের অবমাননায় লজ্জিত ও ব্যথিত হয়ে উঠেছিল নিশ্চয়ই।

"পরে সেই ভাঙা হাট জোড়া দিয়ে অন্য একদিন আবার মুলতুবি শরৎ-বন্দনা করা হয়েছিল।" (পৃঃ ৯৫)

রবীন্দ্রনাথের "সম্প্রতি সাংসারিক বিশেষ দুর্যোগ যে কি ছিল তা সংগ্রহ করতে পারিনি; অন্তত, রবীন্দ্রজীবনীতে নেই। আর শরৎ জন্ম-জয়ন্তীতে কি হয়েছিল তার একটা বিবরণ পাওয়া গেল। অন্য কোন বিবরণ পাইনি। শরৎচন্দ্রের অনুযোগ, দু'বছরই এই অপকার্য হয়েছে। এটি অবশ্য বাঙালীদের এক বদভ্যাস। মিলেমিশে নির্বিবাদে কাজ করা তাদের ধাতে নেই। একবারের নমুনাই আমাদের চরিত্র উদ্‌ঘাটনে যথেষ্ট।*

আবার বিতর্ক

একযুগ পর আবার সাহিত্য নিয়ে বিতর্ক ঘটল। এই বিতর্কের শিরোনাম৷ 'সাহিত্যের মাত্রা'। শরৎচন্দ্র 'পরিচারক' সম্পাদক শ্রীঅতুলানন্দ রায়কে লেখেন: কল্যাণীয়েষু, শ্রাবণের (১৩৪০) 'পরিচয়' পত্রিকায় শ্রীমান্ দিলীপকুমারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র—সাহিত্যের মাত্রা—সম্বন্ধে তুমি আমার অভিমত জানতে চেয়েচ।...শেষ ক'লাইনের আসল বক্তব্য যদি এই হয় যে, ইয়োরোপ তার যন্ত্রপাতি ধন-দৌলত, কামান-বন্দুক, মান-ইজ্জত-সমেত অচিরে ডুববে, তবে অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে এই কথাই মনে করব যে, বয়স ত অনেক হ'ল, ও বস্তু কি আর চোখে দেখে যাবার সময় পাব!

"কিন্তু এদের ছাড়াও কবি আরও যাদের সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়েচেন, তোমাদের সন্দেহ, তার মধ্যে আমিও আছি। অসম্ভব নয়। এ-প্রবন্ধে কবির অভিযোগের বিষয় হ'ল ওরা 'মত্তহস্তী,' 'ওরা বুলি আওড়ালে,' 'পালোয়ানি করলে,' 'কসরৎ কেরামত দেখালে,' 'প্রব্লেম সল্‌ভ করলে' অতএব ওদের, ইত্যাদি ইত্যাদি।"৩২

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: বিজ্ঞানের প্রসাদে আধুনিক বাণিজ্যপদ্ধতিতে চলছে প্রভূত পণ্য-উৎপাদন। তার জন্য প্রকাণ্ড ফ্যাক্টরির দরকার। চার দিকের মানবসংসারের সঙ্গে তার সহজ মিল নেই। এইজন্যে এক-একটা কারখানার শহর পরিস্ফীত হয়ে উঠছে, ধোঁয়াতে কালিতে যন্ত্রের গর্জনে ও

---

* শরৎ-জন্ম-শতবার্ষিকী নিয়েও বাঙালীর চিরাচরিত দলাদলি সেদিন-কার মতই প্রকট।

(৩২) শঃ সাঃ সঃ, ৮ম সম্ভার, পৃঃ ৩৮৩

আবর্জনায় তারা জড়িত বেষ্টিত, সেই সঙ্গে গুচ্ছ গুচ্ছ বিস্ফোটকের মতো দেখা দিয়েছে মজুর-বসতি। এক দিকে বিরাট যন্ত্রশক্তি উদ্‌গার করছে অপরিমিত বস্তুপিণ্ড, অন্য দিকে মলিনতা ও কঠোরতা শব্দে গন্ধে দৃশ্যে স্তূপে স্তূপে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে। এর প্রবলত্ব ও বৃহত্ত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কারখানা ঘরের সেই প্রবলত্ব ও বৃহত্ত্ব সাহিত্যে দেখা দিয়েছে উপন্যাসে, তার ভূরি আনুষঙ্গিকতাকে নিয়ে ......

"অবশ্য গল্পে পলিটিক্‌সপ্রবণ কোনো ব্যক্তির চরিত্র যদি আঁকতে হয় তবে তার মুখে পলিটিকসের বুলি দিতেই হবে, কিন্তু লেখকের আগ্রহটা যেন বুলি জোগান দেওয়ার দিকে না ঝুঁকে পড়ে চরিত্ররচনের দিকেই নিবিষ্ট থাকে।......

"সামাজিক প্রয়োজনের গুরুতর তাগিদ এসে পড়ল, অর্থাৎ তখনকার দিনে প্রব্‌লেম।......সনাতনী ও অধুনাতনী লেখক এই প্রবলেমটাকে নিয়ে আপন পক্ষের সমর্থনরূপে তাঁদের নভেলে লম্বা লম্বা তর্ক স্তূপাকার করে তুলতে পারেন। এরকম অত্যাচার কাব্যে গর্হিত কিন্তু উপন্যাসে বিহিত এমন একটা রব উঠেছে।......নভেলে কোনো-একজন মানুষকে ইনটেলেক্‌চুয়েল প্রমাণ করতে হবে অথবা ইনটেলেক্‌চুয়েলের মনোরঞ্জন করতে হবে বলেই বইখানাকে এম, এ, পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরপত্র করে তোলা চাই, এমন কোনো কথা নেই। গল্পের বইয়ে যাঁদের থীসিস পড়ার রোগ আছে, আমি বলব, সাহিত্যের পদ্মবনে তাঁরা মত্ত হস্তী।......

"প্রাণের একটা স্বাভাবিক ছন্দমাত্রা আছে, এই মাত্রার মধ্যেই তার স্বাস্থ্য, সার্থকতা, আর শ্রী। এই মাত্রাকে মানুষ জবরদস্তি করে ছাড়িয়ে যেতেও পারে। তাকে বলে পালোয়ানি......

"পশ্চিম মহাদেশের এই কায়াবহুল অসংগত জীবনযাত্রার ধাক্কা লেগেছে সাহিত্যে। কবিতা হয়েছে রক্তহীন, নভেলগুলো উঠেছে বিপরীত মোটা হ'য়ে। সেখানে তারা সৃষ্টির কাজকে অবজ্ঞা করে ইন্‌টেলেকচুয়েল কসরতে কাজে লেগেছে।......

"য়ুরোপে অপ্রাণের বোঝা প্রাণের উপর চেপেছে অতিপরিমাণে; সেটা সইবে না। তার সাহিত্যেও সেই দশা।"৩৩

(৩৩

মনের ইরিটেশন

সবিনয়ে নিবেদন, রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মন্তব্যের সঙ্গতি দেখিনে ; তাঁর উদ্ধৃতিগুলোও যথাযথ নয়। তবু তিনি বলেছেন : "এই কথাগুলো যাদেরকেই বলা হোক, সুন্দরও নয়, শ্রুতিসুখকরও নয়। শ্লেষ-বিদ্রূপের আমেজে মনের মধ্যে একটা ইরিটেশান আনে। তাতে বক্তারও উদ্দেশ্য যায় ব্যর্থ হয়ে, শ্রোতারও মন যায় বিগড়ে।"

অর্থাৎ প্রবন্ধ পড়ে, না, অতুলানন্দের খোঁচায় শরৎচন্দ্রের মনে ধারণা হয়েছে, লক্ষ্যটা তিনিও 'অসম্ভব' নয় ; তাই 'ইরিটেশানে' ও বেগড়ানো মনে তিনি বলেছেন, "অথচ ক্ষোভ প্রকাশ যেমন বাহুল্য, প্রতিবাদও তেমনি বিফল। কার তৈরী-করা বুলি আওড়ালুম, কোথায় পালোয়ানি করলুম, কি 'খেল্‌' দেখালুম, ক্রুদ্ধ কবির কাছে এ-সকল জিজ্ঞাসা অবান্তর।" ব'লে ছেলেবেলাকার গু মারাবার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের মাত্রা' পড়ে কিন্তু একবারও কোথাও মনে হয়নি শরৎচন্দ্র এর লক্ষ্য হ'তে পারেন। শরৎচন্দ্র পলিটিক্‌স নিয়ে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লিখেছেন একটি ; সে প্রসঙ্গ চুকে গেছে। 'ইনটেলেকচুয়েল কসরৎ' যদি কোথাও থাকে তো আছে 'চরিত্রহীন', 'শেষ প্রশ্নে'। কিন্তু গোটা প্রবন্ধের লক্ষ্যই হ'ল পশ্চিমে যন্ত্রসভ্যতার পটভূমিকায় আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্য। শরৎচন্দ্র এটি নিজের গায়ে কেন মাখলেন বোঝা মুস্কিল। তবে শরৎচন্দ্র একথাও বলেছেন যে, 'সাহিত্যের মাত্রা'ই বা কি, আর অন্য প্রবন্ধই বা কি, একথা অস্বীকার করিনে, কবির এই ধরণের অধিকাংশ লেখাই বোঝবার মত বুদ্ধি আমার নেই।" এই স্বীকৃতিই যদি শেষ কথা হ'ত তাহ'লে ভুল বোঝা-বুঝিটা ধরা যেত। কিন্তু শরৎচন্দ্র ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন, প্রতিবাদও করেছেন এবং করতে গিয়ে বিরক্তচিত্তে লিখেছেন, "তাঁর উপমা উদাহরণে আসে কল-কব্জা, আসে হাট-বাজার হাতী-ঘোড়া জন্তু-জানোয়ার—ভেবেই পাইনে মানুষের সামাজিক সমস্যায় নর-নারীর পরস্পরের সম্বন্ধ বিচারে এ সব আসেই বা কেন এবং এসেই বা কি প্রমাণ করে ? শুনতে বেশ লাগ-সই হলেই ত তা যুক্তিযুক্ত হয়ে ওঠে না।"

শরৎচন্দ্র কিন্তু যে ইরিটেশানের অভিযোগ এনেছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সম্পর্কে তিনি তাই প্রকাশ করেছেন তাঁর নিজের প্রবন্ধে। নইলে ওপরের উদ্ধৃতির শেষ বাক্যটিই শুধু নয়, পরে তারই পুনরাবৃত্তি ক'রে এমন অশ্রদ্ধের

কথা বলতে পারতেন না যে, "এসব উপমা শুনতে ভাল, দেখতেও চক্‌চক্‌ করে, কিন্তু যাচাই করলে দাম যা ধরা পড়ে তা অকিঞ্চিৎকর।" দৃষ্টান্ত? "কিছুদিন পূর্ব্বে হরিজনদের প্রতি অবিচারে ব্যথিত হয়ে তিনি প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের মতিবাবুকে লিখেছিলেন, ব্রাহ্মণীর পোষা বিড়ালটা এঁটো মুখে গিয়ে তাঁর কোলে বসে, তাতে শুচিতা নষ্ট হয় না—তিনি আপত্তি করেন না। খুব সম্ভব করেন না, কিন্তু তাতে হরিজনদের সুবিধা হল কি? প্রমাণ করলে কি?"

বেড়াল বনাম মানুষ

শরৎচন্দ্রের এই প্রশ্নটি দুর্বোধ্য। উপমাটা সরল। শুচিবাইগ্রস্ত মানুষ জানোয়ারকে আস্কারা দেয়, কিন্তু মানুষকে ছোঁয় না বা অস্পৃশ্য মানুষের ছোঁয়া জিনিসও ছোঁয় না, ঘেন্না করে। দূরে রাখে। এ অমানবিক, অকারণ নিষ্ঠুরতা। তারই দৃষ্টান্ত—যদি মানুষের চেতনা হয়। বরং শরৎ চন্দ্রের একথা অবান্তর যে, "বেড়াল কেন কোলে বসে, পিঁপড়ে কেন পাতে ওঠে [যা রবীন্দ্রনাথ বলেন নি], এ-সব তর্ক তুলে মানুষের সঙ্গে মানুষের ন্যায়-অন্যায়ের বিচার হয় না।...বিরাট ফ্যাক্টরীর প্রভূত বস্তু-পিণ্ড উৎপাদনের অপকারিতা দেখিয়ে মোটা নভেলও অত্যন্ত ক্ষতিকর, এ-কথা প্রতিপন্ন হয় না।"

শরৎচন্দ্র লিখেছেন: "আধুনিককালে কল-কারখানাকে নানা কারণে অনেকেই আজকাল নিন্দে করেন, রবীন্দ্রনাথও করেছেন—তাতে দোষ নেই। বরঞ্চ ওইটেই হয়েচে ফ্যাশন।"

এ নিতান্তই মতামতের ব্যাপার। ফ্যাশন নয়। শরৎচন্দ্র স্বয়ং যাঁর হয়ে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ১৯২১-২২এ লড়েছিলেন সেই চরকা-কুটির শিল্পধর্মী গান্ধীজীও ছিলেন যন্ত্রবিজ্ঞানের বিরোধী; যন্ত্র উদ্ভাবনের প্রথম যুগে লাড্ডা-ইটরাও যন্ত্র ভাঙত এই বিশ্বাসে যে, যন্ত্রই তাদের সকল দুঃখের মূল। ক্রমে সবাই বুঝেছে ওটা দৃষ্টির ভ্রান্তি মাত্র. ওরা সমাজ ব্যবস্থা, উৎপাদন-সম্পর্ক ও তারই ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা রাষ্ট্রই যে তাদের সকল দুঃখের মূল তা না দেখে দেখেছে কাছের যন্ত্রকে। যন্ত্র—দানব, দানবের পরিচালক সমাজ কাঠামো। যন্ত্র প্রকৃতি থেকে আহৃত, প্রকৃতিরই রূপান্তর, সেই বিজ্ঞান—যা বলে, 'মানব না, মানাব'। জল, আগুন, বাষ্প থেকে পারমাণবিক শক্তি অবধি। মানুষকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে মার্ক টাইম করানো যাবে না, বরং ওর গতিকে বেদনার

মধ্য দিয়ে হলেও এমনভাবে চালাতে হবে যাতে মানবকল্যাণ হয়। দ্বন্দ্ব সেইখানে, সমাজ আপন গতিতে এগোতে চায়, মানুষ আপন মেধায় আবিষ্কার করে, উদ্ভাবন করে, অচেতন জনসাধারণকে পাশ কাটিয়ে চতুরেরা সব-কিছু আয়ত্ত করে। কিন্তু সে যন্ত্র নয়, যন্ত্রের নিজস্ব প্রাণ নেই, প্রাণ আছে যন্ত্রীর, সে যন্ত্রীর যাতে হৃদয়ও থাকে সেই আকুতি মানুষের নানা ভাবে—বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক কাল্পনিকরূপে প্রকাশ পায়। শরৎচন্দ্র ওটাকে ফ্যাশন না ব'লে যদি যন্ত্রোদ্ভাবনকে এক ঐতিহাসিক অভিব্যক্তিরূপে দেখাতেন তবে যাঁরা যন্ত্রবিরোধী তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য পরিষ্কার হ'ত।

তবে শরৎচন্দ্রের একথা নিশ্চয়ই একশবার গ্রাহ্য যে, "এই বহু-নিন্দিত বস্তুটার সংস্পর্শে যে মানুষগুলো ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় এসে পড়েচে, তাদের সুখ-দুঃখের কারণগুলোও হ'য়ে দাঁড়িয়েচে জটিল—জীবন-যাত্রার প্রণালীও গেছে বদলে, গাঁয়ের চাষাদের সঙ্গে তাদের হুবহু মেলে না। এ নিয়ে আপসোস করা যেতে পারে, কিন্তু তবু যদি কেউ এদেরই বিচিত্র ঘটনা নিয়ে গল্প লেখে, তা সাহিত্য হবে না কেন?" সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য বলেছেন, কবিও বলেন না যে হবে না।" তবে বিরোধ কোথায়?—"না, সাহিত্যের মাত্রা লঙ্ঘনে।" শরৎচন্দ্রের প্রশ্ন—"কিন্তু এই মাত্রা স্থির হবে কি দিয়ে?" এ প্রশ্ন সঙ্গত, কিন্তু এ কথা সঙ্গত নয়—"কলহ দিয়ে, না কটু কথা দিয়ে?" কেননা, "কবি বলেচেন স্থির হবে সাহিত্যের চিরন্তন মূলনীতি দিয়ে।" এখানে মতদ্বৈধ হ'তে পারে; কিন্তু মর্মার্থ কি তা বোঝা যায়। শরৎচন্দ্র দ্বিমত প্রকাশ করেছেন, এ করবার অধিকার তাঁর আছে। তিনি বলেছেন, "এই 'মূলনীতি' লেখকের বুদ্ধির অভিজ্ঞতা ও স্বকীয় রসোপলব্ধির আদর্শ ছাড়া আর কোথাও আছে কি?" অন্তত, এ প্রশ্ন অসঙ্গত নয়; কিন্তু একথা অসঙ্গত যে, "চিরন্তনের দোহাই পাড়া যায় শুধু গায়ের জোরে, আর কিছুতে নয়। ওটা মরীচিকা।" শরৎচন্দ্রের এই কি উপলব্ধি? রামায়ণ মহাভারতের কালিদাস ভবভূতির, টলস্টয়-সেক্সপীয়ার প্রমুখের অব্যাহত আবেদনের কি ব্যাখ্যা হবে তবে?

শব্দ নিয়ে কলহ

শরৎচন্দ্র যা নিন্দা করতে চেয়েছেন সেই 'কলহ'ই কিন্তু প্রকাশ পেয়েছে তাঁর এই প্রবন্ধে। তিনি অহেতুক উল্লেখ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে ক'বার 'ইনটালেক্‌ট' ও 'প্রব্‌লেম' শব্দ দুটি প্রয়োগ করেছেন। আমি গুণে

দেখেছি, কবি 'ইন্‌টেলেকচুয়েল" শব্দটি ব্যবহার করেছেন পাঁচবার, 'ইনটে-লেক্‌ট' একবার 'ইনটালেক্‌ট' একবারও নয় এবং প্রব্‌লেম শব্দটা নিয়োগ করেছেন দু'বার। তার সঙ্গে প্রবন্ধের মর্মের কি সম্বন্ধ? এবং তাতে কি প্রমাণ হয়?

শরৎচন্দ্র লিখেছেন: "কবি বলচেন, 'উপন্যাস সাহিত্যেরও সেই দশা। মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েছে।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, বলতে পার, বর্ত্তমানে এটা অপরিহার্য; তাই বলে বলতে পার না, এটা সাহিত্য। "শরৎচন্দ্র একথা খণ্ডন ক'রে বলেছেন, কেউ যদি বলে, 'উপন্যাস-সাহিত্যের সেই দশা নয়, মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়ে নি, চিন্তার সূর্য্যালোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেচে' তাকে নিরস্ত করা যাবে কোন্ নজীর দিয়ে? এবং এরই সঙ্গে আর একটা বুলি আজকাল প্রায়ই-শোনা যায়, তাতে রবীন্দ্রনাথও যোগান দিয়েচেন এই বলে যে, 'যদি মানুষ গল্পের আসরে আসে, তবে সে গল্পই শুনতে চাইবে, যদি প্রকৃতিস্থ থাকে।' বচনটি স্বীকার করে নিয়েও পাঠকেরা যদি বলে—হাঁ, আমরা প্রকৃতিস্থই আছি, কিন্তু দিন-কাল বদলেচে এবং বয়েসও বেড়েচে; সুতরাং রাজপুত্র ও ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্পে আর আমাদের মন ভরবে না, তাহলে জবাবটা যে তাদের দুর্বিনীত হবে, এ আমি মনে করিনে।" (মোটা অক্ষর আমার) কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কী বলেছেন যে, শরৎচন্দ্র 'বচন' ও 'দুর্বিনীত' শব্দ দুটি অযথা প্রয়োগ করলেন? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সাহিত্যের মূল নীতি চিরন্তন। অর্থাৎ রসসম্ভোগের যে নিয়ম আছে তা মানুষের নিত্য-স্বভাবেব অন্তর্গত। যদি মানুষ গল্পের আসরে আসে তবে সে গল্পই শুনতে চাইবে, যদি প্রকৃতিস্থ থাকে। এই গল্পের বাহন কী, না, সজীব মানব-চরিত্র। আমরা তাকে একান্ত সত্যরূপে চিনতে চাই, অর্থাৎ আমার মধ্যে যে ব্যক্তিটা আছে সে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিরই পরিচয় নিতে উৎসুক।" "রবীন্দ্রনাথ কোথাও তো বলেন নি, 'গল্পে চিন্তাশক্তির ছাপ থাকলে তা পরিত্যাজ্য' কিংবা 'বিশুদ্ধ লেখবার জন্যে লেখকের চিন্তাশক্তি বিসর্জ্জন' দেওয়া প্রয়োজন?

শরৎচন্দ্র লিখেছেন, "কবি মহাভারত ও রামায়ণের উল্লেখ করে ভীষ্ম ও রামের চরিত্র আলোচনা করে দেখিয়েচেন, 'বুলি'র খাতিরে ও দুটো চরিত্রই মাটি হয়ে গেছে।"

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ঠিক এই কথা বলেন নি। তিনি বলেছেন, "কোনো-এক কালে আমাদের দেশে চরিত্রনীতি সম্বন্ধে আগ্রহ বিশেষ কারণে অতি-

প্রবল ছিল। এই জন্য পাঠকের বিনা আপত্তিতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ইতিহাসকে শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম দীর্ঘ এক পর্ব জুড়ে নীতিকথায় প্লাবিত ক'রে দিলেন। তাতে ভীষ্মের চরিত্র গেল তলিয়ে প্রভূত সদুপদেশের তলায়।" রাম-চরিত্র সম্বন্ধে বলেছেন, "যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত রামায়ণে রামের যে দেখা পাওয়া গেছে সেটাতে চরিত্রই প্রকাশিত। তার মধ্যে ভালো দিক আছে, মন্দ দিক আছে, আত্মখণ্ডন আছে। দুর্বলতা যথেষ্ট আছে।......কিন্তু উত্তরকাণ্ড এল বিশেষ কালের বুলি নিয়ে ; কাঁচপোকা যেমন তেলাপোকাকে মারে তেমনি করে চরিত্রকে দিলে মেরে।"

আলোচনাতীত

কিন্তু শরৎচন্দ্র মহাভারত রামায়ণ নিয়ে আদৌ কোন আলোচনায় রাজি নন। "কারণ ও-দুটো গ্রন্থ শুধু কাব্যগ্রন্থই নয়, ধর্মপুস্তক ত বটেই, হয়ত বা ইতিহাসও বটে।" যদি ধর্মপুস্তক হয় তবে অবশ্যই গণ্ডীবদ্ধ থাকতে হয় এবং মুসলিম সমাজের অচলায়তনকে পবিত্রতম নিদর্শনরূপে গণ্য করতে হয়, শরৎচন্দ্রের ব্রাহ্মণ্যধর্মের হিন্দুসমাজ নয়। ধর্মপুস্তক সম্পর্কে আলোচনার অনুদারতা মানুষের হৃদয়কে প্রসারিত করে না, সতীদাহ ও বৈধব্য ও অরক্ষণীয়াই দুর্লঙ্ঘ সত্য হয়ে থাকে। আর ও যদি ইতিহাস ব'লে মানতে হয় তবে ঐতিহাসিক চরিত্র একশবার যাচাই করার, সমালোচনা করার অধিকার মানুষের কাছে। যাঁদের অনার্য বা রাক্ষস বলা হয়েছে তাঁদের রাষ্ট্রাধিপত্য থাকলে তাঁরাও বালীবধ কাব্য বা রাবণায়ণ লিখে ইতিহাস-প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারতেন। ইতিহাস সচরাচর শাসকশ্রেণীর লিপিবদ্ধ অনৃত-ভাষণ ; সত্যাবিষ্কারে তার যাচাই একান্তই বাঞ্ছনীয়। আজ পৃথিবী এত বড় অথচ এত কাছাকাছি যে, রুশিয়ার নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাস রুশ দেশের ক্ষুদ্র সীমানায় ঠাঁই না পেলেও পৃথিবীর ইতিহাসের বিস্তৃত বক্ষপটে যোগ্য-স্থানই পায়।

শরৎচন্দ্র যে অত্যন্ত তিক্ত আবেগে এই প্রবন্ধ লিখেছেন তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ-লিখিত 'যোগাযোগ' উপন্যাসের নায়িকা কুমু এবং তার প্রবলেম সমাধানের আকস্মিক উল্লেখ। রবীন্দ্রনাথ যেখানে সাধারণভাবে আলোচনা করেছেন সেখানে এরকম একটি উপন্যাসের উল্লেখ শরৎচন্দ্রের মানসিক বিক্ষুপতাই প্রকাশ করেছে। যোগাযোগের 'প্রব্লেম' সমাধান নিয়ে দ্বিমত থাকতে পারে, অনেকের মনোমত না হ'তে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের

প্রবন্ধ যদি শরৎচন্দ্রও অন্যতম লক্ষ্য হ'য়ে থাকতেন ও শরৎচন্দ্রের কোন একটি বিশেষ উপন্যাসের নামোল্লেখ থাকত তবেই যোগাযোগের প্রসঙ্গ উত্থাপনের প্রাসঙ্গিকতা থাকত। সেখানে ক্ষান্ত না হয়ে শরৎচন্দ্র জলধর সেনকে টেনে এখানে কিছু শ্লেষ কটাক্ষও করলেন। পৃথক ক'রে রবীন্দ্র-উপন্যাস আলোচনায় বা একান্তভাবে 'যোগাযোগ' আলোচনায় হয়তো এই ব্যঙ্গকৌতুক মানিয়ে যেতে পারত কিন্তু 'সাহিত্যের' মাত্রা আলোচনায় এই প্রক্ষেপ বড্ড বেমানান হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ও ইবসেন

"পরিশেষে" শরৎচন্দ্র রবীন্দ্র-উত্থাপিত ইবসেন প্রসঙ্গে বলেছেন, ইবসেন আজ ফিকে হয়ে আসতে পারে, কিছুকাল পরে সে আর চোখে না পড়তে পারে, "কিন্তু তবুও এটা অনুমান, প্রমাণ নয়। পরে একদিন এমনও হতে পারে, ইবসেনের পুরানো আদর আবার ফিরে আসবে।" কিন্তু এও তো অনুমান, প্রমাণ নয়, অকারণ তর্কের খাতিরে তর্ক! তবে, শরৎচন্দ্রের একথা মানি, "বর্তমানকালই সাহিত্যের চরম হাইকোর্ট নয়।" কিন্তু দুর্ভাগা সাহিত্যিকের পক্ষে বর্তমানই রূঢ়তম কাল, চিতায় মঠ তার কোন কাজে লাগে না।

অরবিন্দ-রবীন্দ্র প্রসঙ্গ

১৩৪১এর ৩রা মাঘ, পি-৫৬৬ মনোহরপুকুর, কলকাতা, থেকে "পরম কল্যাণীয়" মন্টুকে (দিলীপ রায়কে), লিখলেন: কাল রাত্তে দেশের বাড়ি থেকে এ বাড়িতে ফিরে এসেছি। তোমার চিঠিগুলো পেলাম। একটা একটা ক'রে জবাব দিই কাজের ব্যাপারগুলো—"

নম্বর দিয়ে দিয়ে লিখেছেন। ৪ নম্বরে 'নিস্কৃতি' অনুবাদ করার কথা আছে, অনুবাদ করবেন 'মন্টু', দেখে দেবেন শ্রীঅরবিন্দ নিজে। গল্পটা তাঁর খুবই ভালো লেগেছে। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে introduce করাবার কথা হয়েছিল; তাই ৭ নম্বরে লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথ আমাকে introduce ক'রে দিতে চাইবেন ব'লে ভরসা করিনে। আমার প্রতি ত তিনি প্রসন্ন নন। তা ছাড়া এত সময়ই বা কই? সাহিত্যসেবার কাজে তিনি আমার গুরুকল্প। তাঁর ঋণ আমি কোন কালে শোধ করতে পারবো না, মনে মনে তাঁকে এমনি ভক্তি-শ্রদ্ধাই করি। কিন্তু ভাগ্য বাদ

সাধলো,—আমার প্রতি তাঁর বিমুখতার অবধি নেই। সুতরাং এ চেষ্টা করা নিরর্থক।"

কিন্তু আমরা দেখেছি, এ শরৎচন্দ্রের অনুমান মাত্র। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রশংসা নিজে যেচে করেছেন কিন্তু কোন বিরূপ মন্তব্য নিজে যেচে করেন নি। সর্বশেষ যে লেখাটির মধ্যে (সাহিত্যের মাত্রা) শরৎচন্দ্র নিজেকে অন্যতম লক্ষ্য মনে করেছেন, তাতে কিন্তু তাঁর প্রতি কোথাও কোন সুস্পষ্ট কটাক্ষ নেই।

১৩৪২ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনে ছাত্র-সম্মেলনে বক্তৃতাকালেও তিনি আধুনিক সাহিত্য প্রসঙ্গ আনেন এবং বলেন, "এই ধরণের আলোচনা না হওয়াই ভাল। ......সাহিত্যের যেগুলি থাকিবার তাহা থাকিবে এবং যাহা না থাকিবার তাহা লোপ পাইবে।

সাহিত্য ও যুগধর্ম

"সাহিত্য গড়িয়া উঠে যুগধর্মে—সমালোচনা অথবা সহযোগিতা দ্বারা গড়িয়া উঠে না। সমস্ত জিনিসেরই একটা ক্রমোন্নতি আছে, নাই শুধু সাহিত্যের ব্যাপারে। কালিদাসের পর, শকুন্তলাকে যদি আরও ভাল করিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে যত লোক ইহা পড়িয়াছেন, যত লোক অনুকরণ করিয়াছেন, যত লোক ইহাকে ভাল বলিয়াছেন—তাঁহারা শকুন্তলা হইতে উৎকৃষ্টতর নাটক রচনা করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা হয় নাই। মহাকবি কালিদাস যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাই বড় হইয়া আছে। রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ করিয়া অনেকেই অনেক-কিছু লিখিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনা ও এই অনুকরণের মধ্যে আসমান-জমি প্রভেদ।"

ঐ বছরই অর্থাৎ ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে, মাসখানেক আগে, 'মন্টু'কে লিখেছিলেন, "তুমি হয়ত জানোনা যে, আমি ৮।৯ মাস অত্যন্ত অসুস্থ। শয্যাগত বললেও অতিশয়োক্তি হয়না। গেল জ্যৈষ্ঠ মাসে দেশের বাড়ি থেকে এখানে আসবার পথে sun-stroke-এর মতো হয়, সেই পর্য্যন্ত চোখের ও মাথার ব্যথায় কত যে পীড়িত সে আর বলব কি। আজও সারেনি, বাকি দিন কটায় সারবে কি না তাও জানিনে। তার ওপর আছে অর্শের অজস্র রক্তস্রাব (বহু পুরাতন ব্যাধি) এবং মাসখানেক থেকে সুরু হয়েছে মাঝে মাঝে জ্বর। তোমাকে চিঠি লিখচি জ্বরের উপরেই। দেশের বাড়িতেই থাকি, শুধু মাঝে মাঝে একটু ভাল থাকলে ক'লকাতায় আসি। লেখা কিংবা পড়া সমস্তই বন্ধ। খবরের কাগজ পর্য্যন্ত না। এ জীবনের

মতো লেখাপড়া যদি শেষ হয়েই থাকে ত অভিযোগ করব না। যেটুকু সাধ্য ও শক্তি ছিল করেছি, তার বেশি যদি না-ই পারি ক্ষোভ করতে যাবো কেন? মনের মধ্যে আমি চিরদিনই বৈরিগী—এখনও তা-ই যেন থাকতে পারি।"৩৩

[এই গুরুতর অসুস্থাবস্থায় একমাস আগে ছাত্রসভায় কিভাবে ভাষণ দিলেন বোঝা মুস্কিল। এম-সি-সরকার পরিবেষিত শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহের তারিখ ইত্যাদিতে ভ্রান্তি ও মুদ্রণ প্রমাদে মাঝে মাঝে বিপন্ন বোধ করতে হয়। শরৎ-সাহিত্যকে বর্ষক্রমে সাজানো হয়নি; সুতরাং, এক্ষেত্রেও ভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে]।

এই পত্রে শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গত লিখেছেন: "বুদ্ধদেব বসুর 'বাসর ঘর' বই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কি বলেছেন আমি দেখিনি। বুদ্ধদেব বসু যদি বলে থাকেন, আমার চেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঢের বড় ঔপন্যাসিক, সে তো সত্যি কথাই বলেছে মণ্টু। নিজের মন ত জানে এ সত্য, পরম সত্য।"

আমার স্মৃতি বিভ্রান্তি যদি না ঘটে থাকে তবে সম্ভবত আমি 'বাসর ঘর' এবং বিচিত্রায় চিঠির আকারে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা পড়েছিলাম। বৌদ্ধ-রীতির ব্যতিক্রমে লেখা এই বইখানি রবীন্দ্রনাথের এক দুর্বল অনুকরণ। যদ্দুর মনে পড়ে, প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, কুন্তল মানে চুল, কুন্তলা মানে দাঁড়ায় চুলা, এ নাম কেন রাখলে? জেনে থাকতে বুদ্ধদেবের 'বাসর-ঘর' ও রবীন্দ্রনাথের চিঠি পড়ে বেশ কৌতুক বোধ করেছিলাম। ব্যক্তিগত-ভাবে বুদ্ধদেবের লেখা পড়ে আমার চিত্তে বিরক্তি ছাড়া আর কিছুরই সঞ্চার হয়নি। তাঁর সমালোচনার নীতিও আমার মনে কখনো শ্রদ্ধার উদ্রেক করেনি। সুতরাং তাঁর অভিমত থাক্।

শরৎচন্দ্র বলেছেন: এ ছাড়াও আর একটা কথা এই যে, আমার চেয়ে কে বড়ো কে ছোটো এ নিয়ে যথার্থই আমার মনে কোন আক্ষেপ, কোন উদ্বেগ নেই। রবীন্দ্রনাথ যদি বলতেন, আমার কোন বই-ই উপন্যাস-পদ-বাচ্য নয়, তাতেও বোধ করি একটা সাময়িক বেদনা ছাড়া আর কিছু মনে হতো না।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো এমন-কথা বলেন নি, রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব নন, তাঁর পক্ষে এমন দায়িত্বহীন উক্তি করা সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বরং শরৎচন্দ্রের ক্ষমতাকে বারংবার স্বীকার করেছেন এবং প্রতিভাকে উপহারে পুরস্কৃত করেছেন।

শরৎচন্দ্র বলেছেন: কোন আক্রমণেরই প্রতিবাদ করিনে।" কথাটা যে

(৩৩) শঃ সাঃ সঃ, ১২ সম্ভার।

সর্বাংশে সত্য নয় শরৎচন্দ্র সে-বিষয়ে সচেতন থেকে পরক্ষণেই স্বীকার করেছেন : "যৌবনে এক-আধটা উক্তি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে করেছিলাম বটে, কিন্তু সে আমার প্রকৃতি নয়, বিকৃতি। নানা হেতু থাকার জন্যেই হয়ত ভুল ক'রে করেছিলাম।

"যৌবনের কিছু কিছু ভুলের জন্যে পরিতাপ হয়।"

অসুস্থ অবস্থায় লেখা শরৎচন্দ্রের এই চিঠিটি সত্যি ভারি করুণ। বুদ্ধদেবের মত জীবদ্দশায়ই বিস্মৃতপ্রায় তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর লেখক যেখানে শরৎচন্দ্রকে হেয় করবার স্পর্ধা দেখায় সেখানে সত্যিকারের নিস্পৃহ লোকেরও মনোকষ্ট হতে পারে। শরৎচন্দ্রের যে হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ করিনে। কিন্তু শরৎচন্দ্র না জানুন, আমরা জানি, শরৎ-সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের আয়ুষ্কালব্যাপী চিরজীব থাকবে, বুদ্ধদেবের চিহ্নমাত্রও থাকবে কিনা সন্দেহ।

১৩৪৩ বঙ্গাব্দে বা ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই কলকাতার টাউনহলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদে এক সভা হয়; সে সভার উদ্বোধন করেন শরৎচন্দ্র এবং সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্র সন্নিধানে

রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই সম্পর্কে ৪র্থ খণ্ডের ৬৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : ১৩৪৩ আষাঢ়ের শেষ ভাগে...কলিকাতা হইতে কবির কাছে আসিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও তুলসীচরণ গোস্বামী।...মুসলমান-প্রধান বাংলা-দেশের শাসন ব্যাপারে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দীর্ঘ এক আবেদন বা মেমোরিয়াল ১৯৩৬ সালের (১৩৪৩) গোড়ায় ভারতসচিবের নিকট পাঠানো হইয়াছিল। স্বাক্ষরকারীদের পুরোভাগে ছিল রবীন্দ্রনাথের নাম। এই মেমোরিয়ালের উত্তরে আর্ল-অব জেটল্যাণ্ড (রোনাল্ডসে) ১৯৩৬ জুন ২৫ বড়লাটকে জানাইয়া দেন যে, ১৯৩৫ সালে যে—অ্যাক্ট পাশ হইয়াছে তাহার পরিবর্তনের কোনো কারণ তিনি খুঁজিয়া পাইতেছেন না। (প্রবাসী ১৩৪৩ ভাদ্র, পৃঃ ৭৫৬)...

"ভারত সচিবের উত্তরের প্রত্যুত্তরের জন্য ১৫ই জুলাই (১৯৩৬) কলিকাতায় প্রতিবাদ সভা আহূত হইয়াছে, তদুদ্দেশ্যে শরৎচন্দ্র প্রমুখ আসিয়াছিলেন কবিকে লইবার জন্য। ('রবীন্দ্র জীবনী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬৩)

টাউনহল সভার উদ্বোধনী ভাষণে শরৎচন্দ্র বলেন, "বাংলা হিন্দু

জনগণের আজকের এই সম্মিলনী যাঁরা আহ্বান করেছেন, আমি তাঁদের একজন। এই বিশাল সভা কেবলমাত্র এই নগরের নাগরিকগণের নয়। আজ যাঁরা সমবেত হয়েছেন, তাঁরা বাংলার বিভিন্ন জেলার অধিবাসী। সকলের বর্ণ হয়ত এক নয়, কিন্তু ভাষা এক, সাহিত্য এক, ধর্ম এক, জীবন যাত্রার গোড়ার কথাটা এক,—যে বিশ্বাস যে নিষ্ঠা আমাদের ইহলোক পরলোক নিয়ন্ত্রিত করে, সেখানে আমরা কেউ কারও পর নয়। পর করে দেবার নানা উপায়, নানা কৌশল সত্ত্বেও বলব, আমরা আজ এক। যুগ-যুগান্ত থেকে যে বন্ধন আমাদের এক করে রেখেছে, সত্যিই আজও তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নি।

"বাংলার সেই সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে, যাঁরা এই সভার উদ্যোক্তা, তাঁদের পক্ষ থেকে আমি সবিনয়ে সসম্মানে রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করি—এই বিপুলায়তন সভার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র বলেন, "একটা প্রথা আছে সভাপতির পরিচয় দেওয়া ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই নামের সম্মুখে পিছনে পরিচয়ের কোন বিশেষণ যোগ করা যায় ? বিশ্ব কবি, কবি সার্ব্বভৌম ইত্যাদি অনেক কিছু মানুষে পূর্ব্বেই আরোপ ক'রে রেখেছে। কিন্তু আমরা—যাঁরা তাঁর শিষ্য-সেবক— নিজেদের মধ্যে শুধু 'কবি' বলেই তাঁর উল্লেখ করি। বাইরে বলি রবীন্দ্রনাথ। জানি, সভ্যজগতের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত এই ব্যক্তিটিকে বোঝাবার পক্ষে কারও অসুবিধা ঘটবে না। কবির মন ক্লান্ত, দেহ দুর্ব্বল, অবসন্ন। এই বিপুল জনতার মাঝখানে তাঁকে আহ্বান ক'রে আনা বিপজ্জনক। তবু তাঁকে আমরা অনুরোধ করেছিলাম। মনে মনে ইচ্ছে ছিল, দুনিয়ার কারও না অবিদিত থাকে এই সভার নেতৃত্বের ভার বহন করলেন কে ? কবি স্বীকার করলেন, বললেন, ভাল, তাঁর বক্তব্য তাঁর নিজের মুখ দিয়েই তবে ব্যক্ত হোক।

"তাঁকে আমাদের সকৃতজ্ঞ চিত্তের নমস্কার নিবেদন করি।" ৩৪

এই বছরই শরৎচন্দ্র 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'-এর দশম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি মুসলিম সাহিত্য সমাজের এই নির্বাচনকে "পরম ঔদার্য্য" ব'লে গণ্য করেন। তারিখ, ঢাকা, ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৪৩ ; বিচিত্রা' ভাদ্র, ১৩৪৩-এ প্রকাশিত।৩৫

(৩৪) শঃ সাঃ সং, ৪ সং, পৃঃ ৪২৬

(৩৫) শঃ সাঃ সং, ৬ সং, পৃঃ ৩৮৮

শরৎচন্দ্রের গৃহে কবি

রবীন্দ্রজীবনীকার বলেছেন, "টাউনহলের সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী সভার পর কবিকে আর একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত দেখি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে রবি-বাসরের সপ্তম বর্ষের সপ্তম অধিবেশনে কবি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন (১৩৪৩ শ্রাবণ ৩) ১৯৩৬ জুলাই ১৯।

মুসলিম সমাজ ও সাহিত্য নিয়ে মুসলিম সমাজে যেসব অভিযোগ অনুযোগ আছে তার বিস্তৃত আলোচনাকালে কাজী মোতাহার হোসেনের সঙ্গে তাঁর কি আলাপ হয়েছিল এবং তাই তিনি কিভাবে কল্যাণীয় জাহান-আরার 'বর্ষবাণী'-তে লিখেছিলেন, শ্রদ্ধাস্পদ মহম্মদ হবিবুল্লা 'বুলবুল'-এ যে প্রবন্ধ লেখেন ও লীলাময় রায় (অন্নদাশঙ্কর রায়) তার কি বিরূপ জবাব দিয়েছিলেন তার উল্লেখ করেন। এরও পর মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (ক্যান্টাব ?) এক প্রবন্ধ লেখেন। শরৎচন্দ্র একদিকে লীলাময় রায় অপরদিকে ওয়াজেদ আলীর প্রবন্ধ দুটির বক্তব্যে হতাশা প্রকাশ করেছেন। শরৎচন্দ্র কেবলই এই আশা প্রকাশ করেছেন যে, কলহ-বিবাদ তর্কবিতর্ক বাদ-বিতণ্ডার মধ্যে নয়, পরস্পরের স্নেহ, প্রেম, ক্ষমা আমরা পাবোই পাবো। প্রসঙ্গত তিনি 'মহেশ' গল্পটিরও উল্লেখ করেছেন।

শরৎচন্দ্র লিখেছেন, মানুষ যখন সাহিত্যরচনায় নিবিষ্টচিত্ত তখন সে ঠিক হিন্দুও নয় মুসলিমও নয়। তখন সে তার সর্বজনপরিচিত 'আমি'টাকে বহু দূরে অতিক্রম করে যায়, নইলে তার সাহিত্যসাধনা ব্যর্থ হয়। কিন্তু ওয়াজেদ আলী সাহেব এই "মর্মান্তিক কথা বলেছেন"—'বস্তুত, দুটি বিষম অনাত্মীয় কৃষ্টির সংঘর্ষের ফলে এই বিক্ষোভ। এর জন্য আক্ষেপ বৃথা।'

শরৎচন্দ্র বলেছেন, "এই মনোভাবই যদি সমস্ত হিন্দু-মুসলমানের সত্য হয় ত এই কথাই বলবো যে, এর চেয়ে বড় দুর্গতি মানুষের আর ঘটতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধিও কি জড়বুদ্ধি ? মন তাঁর মুক্ত হয়নি ? এ যদি সত্য তবে ওয়াজেদ আলী সাহেবের এ ভাষা এল কোথা থেকে ? সহজ, সুন্দর ও ও অবলীলায় আপন মনোভাব প্রকাশ করার শক্তি তাঁকে কে দিলে ? এ যুগে এমন লেখক, এমন সাহিত্য-সেবক কে আছে যে, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী নয় ?

মুসলিম সাহিত্য

ঐ বছরই ইংরাজি ৩১এ জুলাই (১৯৩৬) শরৎচন্দ্র ঢাকা রূপলাল হাউসে 'শান্তি' পত্রিকার পক্ষে অনুষ্ঠিত সম্মিলনেও মুসলমান-সাহিত্য সম্পর্কে

বলেন, "ছেলেরা আমার কাছে একখানা বই রাখলে, উপরে লেখা—'শ্যালক বঙ্কিমের গ্রন্থাবলী'। বললাম, অপমান করবার জন্যেই কি এসেছ?…বঙ্কিম দুহিতা বলে একখানা বই—অনেক নোংরা কথা তাতে আছে।…রবীন্দ্রনাথ বললেন, আমার উপরে এদের অনেকগুলো চিঠি এসেছে। আমায় চিঠি দিয়েছে ঔরঙ্গজেব সম্বন্ধে কি কতকগুলি তুলে দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ভয়ানক ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, না, ও সবের ভেতর আর আমি যেতে চাই না। ভোলানাথ যখন মারা গেল তার অপরাধটা কি? [ভোলানাথকে একটা বই প্রকাশের জন্য দোকানে এসে মুসলমান গুণ্ডা হত্যা করেছিল] আক্রাম খাঁর ছেলেই কাগজ চালায়। তাদের spirit এর একটি দৃষ্টান্ত দিই। নরেন দেবের কাছে লেখা চাইতে গেছে, বলে, 'বাংলা থোড়া বহু সমঝতে হেঁ, বোলনে নেই সাকৃতে।' আমাদের আশঙ্কা ওরা প্রথমে বাংলাটাকে নষ্ট করবে ওরা যখন বাংলাকে মাতৃভাষা বলে স্বীকার করে না।"৩৬

এই ভাষণটি ১৩৪৩এ ১৯এ ভাদ্র বাতায়নে প্রকাশিত হয়েছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য এই যে, আমরা বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে কদর্য সাম্প্রদায়িকতা, বাংলাভাষাকে অস্বীকার করে উর্দু বোলের সংমিশ্রিত গুরুপাক খিচুরির প্রচেষ্টা দেখেছি, প্রতিটি আচরণে কুৎসিত হিন্দু বিদ্বেষ লক্ষ্য করেছি, বেদনার সঙ্গে দেখেছি জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় বিরোধিতা, শাসকশক্তির সাযুজ্য, অহির্নিশি নানা স্থলে নিধন ও ধর্ষণে উচ্চনীচ নির্বিশেষে মুসলিম সমাজের মধ্যে এক শ্রেণীর প্রমত্ততা, স্বতন্ত্র সাহিত্য সংস্কৃতি রচনার ব্যর্থতা এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতিক দলগুলোর স্বার্থান্ধ তোষণনীতির বিষময় ফল। আবার আমাদের সৌভাগ্য, আমাদেরই জীবদ্দশায় এক বিস্ময়কর পটপরিবর্তনে উর্দুভাষ্যমুক্ত বাংলা ভাষার জন্য বাঙালী মুসলমানের প্রাণপাত ও স্বাধীনতা-সংগ্রাম করতে দেখলাম। এতে ক'রে তাঁরা যে হিন্দুদের নিকটতর হয়েছেন, হিন্দুদের প্রতিবেশী থাকতে দিয়েছেন তাও নয়, কিন্তু তাঁরা বাঙালী হয়েছেন, বাংলাকে মাতৃভাষারূপে অন্তরের সঙ্গে, প্রাণ দিয়ে স্বীকার করেছেন। মুসলিম নিপীড়নের ইতিহাসকে পরিশুদ্ধ করবার কাজে ওজর আবদার হয়তো যায়নি কিন্তু বাংলা সাহিত্যকে মেনে নিয়েছেন। হয়তো বঙ্কিম গ্রন্থাবলীর বিশেষণটি কোন কোন প্রান্তে রয়ে গেছে কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য অস্বীকৃত হয়নি। ওপারে

(৩৬) শঃ সাঃ সঃ, ৬ সঃ, পৃ ৩৯২

ভোলানাথরা একরকম নেই, কিন্তু এপারে কোনরকম রাজনৈতিক প্ররোচনায় যদি ভোলানাথদের বুকে ছুরি বসে—সে দায় দায়িত্ব থেকে ওঁরা মুক্ত; ওঁরা বাঙলাদেশকে ভালবাসেন, ওঁরা বাংলাভাষাকে ভালবাসেন ওঁরা বাংলাসাহিত্যকে ভালবাসেন—আহা, এই পরম লাভ যদি রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র দেখে যেতেন ওঁদের আনন্দের সীমা থাকত না।

আর মুসলিম সমাজকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করা? সে দায় দায়িত্ব কখনো রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের হ'তে পারে না। হিন্দুসমাজের বিচারক ছিলেন ব্রাহ্মণেরা; আবার, হিন্দু সমাজের অন্তঃক্ষয়ী মানববিরোধী সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন ব্রাহ্মণেরাই; তাঁরাই সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ সমাজের নিজের অন্তরে যদি অসামঞ্জস্য আপনি বিকশিত না হয়ে ওঠে বাইরে থেকে তা করা অসম্ভব। ইংরাজরা আইন করে কিছু করতে পারতেন না যদি রামমোহন বিদ্যাসাগর প্রমুখ সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণেরা উদ্যোগী না হ'তেন, বুক পেতে গোঁড়ামির লক্ষ্যবাণ গ্রহণ না করতেন এবং অনায়াসে সমাজের সকল গরল আকণ্ঠ পান না করতেন। মুসলিম সমাজ যদি আপন বিবরে থাকতে চায় তো তার মুক্তির জন্য হিন্দুসমাজেব ভাবনা বিপদেরই সৃষ্টি করবে। সাহিত্যক্ষেত্রেও সেই কথা। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য দিয়েই বলা যায়, শরৎচন্দ্রের সাহিত্য যেখানে গ্রামকেন্দ্রিক সেখানে তা তত সার্থক ও রসোত্তীর্ণ, কেননা, গ্রামকে তিনি শহরের চাইতেও অনেক বেশি ভাল জানতেন, বরং সেই তুলনায় তাঁর নগরকেন্দ্রিক সাহিত্য দেশের মাটির রস পায়নি; এজন্য অনেক ক্ষেত্রেই তিনি বিলাত ফেরৎ ও ব্রাহ্মদেব সম্পর্কে সুবিচার করতে পারেন নি। কেননা. ঐ নব্যসমাজের সবটাই বাইরে থেকে দেখা, 'পল্লী সমাজ,' 'বামুনের মেয়ে,' 'অরক্ষণীয়ার' মত ক'রে দেখা নয়। তাই, শরৎচন্দ্র যদি মুসলিম সমাজ নিয়ে সাহিত্য চর্চা না ক'রে থাকেন সেটি কেবল সার্থকতা বা রসোত্তীর্ণতার দিক থেকেই সঙ্গত হয়নি ওঁর নিরাপত্তার দিক থেকেও তা সঙ্গত হয়েছে, ।

একষট্টি বছরের আশীর্বাদ

১৩৪৩ এর ১১ই কার্তিক, ২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড, কালীঘাট, কলকাতা, থেকে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখেছেন: "আমার একষট্টি বছরের প্রারম্ভকে কবি আশীর্ব্বাদ করেছেন। অকৃপণ ভাষায়, মন খুলে মঙ্গল কামনা করেছেন। পত্রিকায় যেটুকু প্রকাশিত হয়েছিল সেটা তোমাকে

পাঠালাম। তাঁর নিজের হাতের লেখাটি আমাকে দিয়েছেন, তুমি এজে তাঁর অন্যান্য পত্রের মত এখানিও তোমাকে রাখতে দেবো। তখন কিন্তু এই পত্রাংশটুকু আমাকে ফিরিয়ে দিও।"

এম. সি. সরকার পরিবেষিত শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহের ১৩শ সম্ভারের ৪৬০ পৃষ্ঠায় ঐ পত্রের নীচে ফুটনোটে আছে: "রবিবাসরের উদ্যোগে 'উদয়ন' সম্পাদক অনিল কুমার দে, সাহিত্যবন্ধু বেলিয়াঘাটাস্থ 'প্রফুল্ল কানন' নামক উদ্যানবাটীতে শরৎচন্দ্রের ৬১তম জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই সভায় উপস্থিত থেকে সেদিন এক লিখিত অভিভাষণে শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সুবিধামত ৩১এ ভাদ্র সভা না হয়ে ২৫শে আশ্বিন সভার অনুষ্ঠান হয়েছিল। কবির এই অভিনন্দন বাণীটি এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল:

"কল্যাণীয় শরৎচন্দ্র, তুমি জীবনের নির্দিস্ট পথের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উত্তীর্ণ হয়েছো। এই উপলক্ষে তোমাকে অভিনন্দিত করবার জন্যে তোমার বন্ধুবর্গের এই আমন্ত্রণ সভা। বয়স বাড়ে, আয়ুর সঞ্চয় ক্ষয় হয়, তা নিয়ে আনন্দ করবার কারণ নেই। আনন্দ করি যখন দেখি জীবনের পরিণতির সঙ্গে জীবনের দানের পরিমাণ ক্ষয় হয়নি, তোমার সাহিত্যরস-সত্রের নিমন্ত্রণ আজও রয়েছে উন্মুক্ত, অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ভরে উঠবে তোমার পরিবেশনপাত্র, তাই জয়ধ্বনি করতে এসেছে তোমার দেশের লোক তোমার দ্বারে।

"সাহিত্যের দান যারা গ্রহণ করতে আসে তারা নির্মম। তারা কাল যা পেয়েছে তার মূল্য প্রভূত হলেও আজকের মুঠোয় কিছু কম পড়লেই ভ্রূকুটি করতে কুণ্ঠিত হয় না। পূর্বে যা ভোগ করেছে তার কৃতজ্ঞতার দেয় থেকে দান কেটে নেয় আজ যেটুকু কম পড়েছে তার হিসাব করে। তারা লোভী, তাই ভুলে যায় রসতৃপ্তির প্রমাণ—ভরা পেট দিয়ে নয়, আনন্দিত রসনা দিয়ে; নতুন মাল বোঝাই দিয়ে নয়, স্বাদে চির নতুনত্ব দিয়ে; তারা মানতে চায় না রসের ভোজে স্বল্প যা তাও বেশী; এক যা তাও অনেক।

"এটা জানা কথা যে, পাঠকদের চোখের সামনে সর্বদা নিজেকে জানান না দিলে পুরোনো ফটোগ্রাফের মত জানার রেখা হলদে হয়ে মিলিয়ে আসে। অবকাশের ছেদটা একটু-লম্বা হলেই লোকে সন্দেহ করে যেটা পেয়েছিল সেটাই ফাঁকি, যেটা পায়নি সেটাই খাঁটি সত্য। একবার আলো জ্বলেছিল, তার পরে তেল ফুরিয়েছে—অনেক লেখকের পক্ষে এইটেই সব

চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। কেন না আলো জ্বালাটাকে মানুষ অশ্রদ্ধা করতে থাকে তেল ফুরোনোর নালিশ নিয়ে।

"তাই বলি, মানুষের মাঝ-বয়স যখন পেরিয়ে গেছে তখন যারা তার অভিনন্দন করে তারা কেবল অতীতের প্রাপ্তি স্বীকার করে না, তারা অনাগতের পরেও প্রত্যাশা জানায়। তারা শরতের আউশ ধান ঘরে বোঝাই করেও সেই সঙ্গে হেমন্তের আমনধানের 'পরেও আগাম দাবী রাখে। খুসি হয়ে বলে, মানুষটা এক-ফসলা নয়।

"আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনের মূল্য এই যে, দেশের লোক কেবল যে তাঁর দানের মনোহারিতা ভোগ করেছে তা নয়, তার অক্ষয়তাও মেনে নিয়েছে। ইতস্ততঃ যদি কিছু প্রতিবাদ থাকে ত' ভালোই, না থাকলে ভাবনার কারণ—এই সহজ কথাটা লেখকরা অনেক সময়ে মনের খেদে ভুলে যায়। ভালো লাগতে স্বভাবতই ভালো লাগে না এমন লোককে সৃষ্টিকর্তা যে সৃজন করেছেন। সেলাম করে তাদেরও তো মেনে নিতে হবে—তাদের সংখ্যাও তো কম নয়। তাদের কাজও আছে নিশ্চয়ই। কোনো রচনার উপরে তাদের খর কটাক্ষ যদি না পড়ে তবে সেটাকে ভাগ্যের অনাদর বলেই ধরে নিতে হবে। নিন্দার কুগ্রহ যাকে পাশ কাটিয়ে যায়, জানব প্রশংসার দাম বেশি নয়। আমাদের দেশে যমের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে বাপ মা ছেলের নাম রাখেন এককড়ি দু'কড়ি। সাহিত্যেও এককড়ি দুকড়ি যারা তারা নিরাপদ। যে লেখায় প্রাণ আছে প্রতিপক্ষতার দ্বারা তার যশের মূল্য বাড়িয়ে তোলে তার বাস্তবতার মূল্য। এই বিরোধের কাজটা যাদের তারা বিপরীত পন্থার ভক্ত। রামের ভয়ঙ্কর ভক্ত যেমন রাবণ।"

বাঙালীর হৃদয়-রহস্য

রবীন্দ্রনাথ এতক্ষণ শরৎচন্দ্রের পরিণত বয়স সত্ত্বেও সাধারণের মনে তাঁর অব্যাহত সৃষ্টির প্রত্যাশাকে ব্যক্ত করেছেন এবং বিরূপ সমালোচনাকেও সপ্রশংস ধ্বনির ঐক্যতান বলে অখেদে গ্রহণ করতে বলেছেন। বলেছেন, লোকে তাঁর দানের মনোহারিতাই ভোগ করেছে তাই নয়, অক্ষয়তাও মেনে নিয়েছে; কিন্তু এই লোক কেবল অতীতের প্রাপ্তি স্বীকার করে না. অনাগতের প্রত্যাশাও জানায়। এটি সাধারণ কথা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ক'রে বলেছেন শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য—"জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে" যেমন "বের করেন নানা জগৎ" তেমনি "শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েচে

বাঙালীর হৃদয় রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন বাঙালী যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে।"

রবীন্দ্রনাথ আর কোথাও এমন সুন্দর ক'রে শরৎ-সাহিত্যের এই মনোহারিতা, অক্ষয়তা ও সৃষ্টিমমর্মটি উচ্চারণ করেন নি। তিনি বলেছেন, "তার প্রমাণ পাই তার অফুরান আনন্দে।" এই একটি চমৎকার শব্দে—'অফুরান' —শরৎচন্দ্রের চিরন্তনতা, কালোত্তীর্ণতার ইঙ্গিত রয়েছে, বিশেষ তাঁদেরই এটি লক্ষ্যণীয় যাঁরা শরৎ-সাহিত্য ফুরিয়ে গেছে বলে নিজেদের জাহির বা বিজ্ঞাপিত করতে চান। রবীন্দ্রনাথ বাঙালী পাঠকদের সম্বন্ধে বলেছেন, "যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুসি হয়েছে এমন আর কারো লেখায় তারা হয়নি। অন্য লেখকেরা অনেকে প্রশংসা পেয়েছে কিন্তু সর্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায়নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন।"

এ যেন ক্ষুদ্রচেতা সেই সব বুদ্ধদেবদের উদ্দেশে বলা যাঁরা শরৎচন্দ্রকে হেয় করে অযোগ্যতার ছিন্নকন্থায় নিজেরা পাদপীঠে আসতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ আরও তাৎপর্যময় কথা বলেছেন।

"আজ শরচ্চন্দ্রের অভিনন্দনে বিশেষ গর্ব অনুভব করতে পারতুম যদি তাঁকে বলতে পারতুম তিনি একান্ত আমারি আবিষ্কার।" একদিক থেকে কিন্তু তা-ই, যদি সৌরীন মুখোপাধ্যায়ের কথাটা ভিত্তিহীন না হয়। গোড়াতেই সে-কথাটা বলেছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবে সে গৌরবের অধিকারী হ'তে নারাজ। তিনি বলেছেন, কিন্তু তিনি কারো স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞানপত্রের জন্যে অপেক্ষা করেন নি। আর তাঁর অভিনন্দন বাঙলাদেশের ঘরে ঘরে স্বত-উচ্ছ্বসিত। শুধু কথা-সাহিত্যের পথে নয়, নাট্যাভিনয়ে চিত্রাভিনয়ে তাঁর প্রতিভার সংশ্রবে আসবার জন্যে বাঙালীর ঔৎসুক্য বেড়ে চলেছে। **তিনি বাঙালীর বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন।"** (মোটা অক্ষর আমার)

বেদনার কেন্দ্রে বাণীর স্পর্শ

রবীন্দ্রনাথ কাব্যে ও কাহিনীতে এমন অনেক কথা দিয়েছেন যেসব শাশ্বত বাণীরূপে মানুষের মস্তিষ্কে ও হৃদয়ে উৎকীর্ণ হ'য়ে আছে। এও তেমনি একটি কথা: তিনি বাঙালীর বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন। শরৎসাহিত্য পর্যালোচনায় এই কথাটির মূল্য অসামান্য।

রবীন্দ্রনাথ এই ব'লে উপসংহার করেছেন :

"সাহিত্যে উপদেষ্টার চেয়ে স্রষ্টার আসন অনেক উচ্চে। চিন্তাশক্তির বিতর্ক নয়, কল্পনাশক্তির পূর্ণ দৃষ্টিই সাহিত্যে শাশ্বত মর্যাদা পেয়ে থাকে। কবির আসন থেকে আমি বিশেষভাবে সেই স্রষ্টা সেই দ্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্যদান করি। তিনি শতায়ু হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী করুন—তাঁর পাঠকের দৃষ্টিকে শিক্ষা দিন মানুষকে সত্য করে দেখতে, স্পষ্ট করে মানুষকে প্রকাশ করুন তার দোষে-গুণে ভালোয়-মন্দয়,—চমৎকারজনক শিক্ষাজনক কোন দৃষ্টান্তকে নয়—মানুষের চিরন্তন অভিজ্ঞতাকে প্রতিষ্ঠিত করুন তাঁর স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ভাষায়।"

রবীন্দ্রজীবনীকার লিখেছেন : "শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে কী যে শ্রদ্ধা করিতেন তাহার কথা বাঙালি পাঠকের সুবিদিত নহে। দুই একটি ঘটনার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অমল হোমের বিবাহসভায় রবীন্দ্রনাথকে বহুকাল পরে দেখিয়া তিনি অমলকে লিখিয়াছিলেন : 'অনেক দিন পরে রবীন্দ্রনাথকে দেখলাম। কী আশ্চর্য সুন্দর—চোখ ফেরানো যায় না। বয়স যত বাড়ছে রূপ যেন তত ফেটে পড়ছে। না, রূপ নয়—সৌন্দর্য। জগতে এত বড় বিস্ময় জানি না।' এইটি লেখেন ১৯২৭ সালের শেষে।...... ১৯১৭ সালে কলিকাতার বিচিত্রাভবনে শরৎচন্দ্র প্রায়ই আসিতেন; লেখক তখন কলিকাতায় থাকিতেন। একদিন নবীন সাহিত্যিকের দল নানা প্রশ্নের মধ্যে শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করে কবির 'গোরা' তিনি পড়িয়াছেন কিনা। শরৎচন্দ্র তাঁহার স্বভাব চঞ্চল ভঙ্গিতে বলিলেন, 'গোরা! চৌষট্টিবার—চৌষট্টি-বার পড়েছি।'

"চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং রবীন্দ্রভক্ত বলিয়া তাঁহার খ্যাতি সর্বজনবিদিত। তিনি লিখিতেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের হৃদয়ে একটা গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং রবীন্দ্র-সাহিত্য সে খুব মনোযোগ দিয়াও পড়িয়াছিল। দ্বিতীয়বার ঢাকায় গিয়া সে অসুস্থ হইয়া পড়ে। সেই সময়ে দেখিয়াছি দু-একদিন জ্বরের ঘোরে অনর্গল সে 'বলাকা'র কবিতা আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছে, প্রত্যেকটি কবিতা তার সম্পূর্ণ মুখস্থ।......কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের লেখার নিন্দা করিলে সে বড়ো ব্যথিত হইত।" ৩৭

মর্মান্তিক যে, সমগ্র সচেতন শ্রদ্ধাশীল বাঙালীর আকাঙ্খাকে প্রতিধ্বনিত করে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ২৫এ আশ্বিন বা ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্রের উদ্দেশে

(৩৭) রবীন্দ্রজীবনী, ৪র্থ-খণ্ড, পৃঃপৃঃ ৭৫-৭৬

শতায়ুর আশীর্বাদ করেছিলেন তা বাঙালীর ভাগ্যে সফল শরৎচন্দ্র ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে (মতান্তরে ১৩৪৪, মাঘ ২) বা ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি ইহলোক ছেড়ে গেলেন। শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ১৫ই সেপ্টেম্বর বা ১২৮৩ বঙ্গাব্দে ৩১ ভাদ্র। রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন শরৎচন্দ্রের ১৫ বছর আগে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বা ১২৬৮ বঙ্গাব্দে ; পরলোকগমন করেন ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট বা ১৩৪৮এর ২২-এ শ্রাবণ। তিন বছরের ব্যবধান।

অমৃতের সন্তান

'রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে লিখলেন :

"যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে,
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি,
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি।" ৩৮

সাধারণ্যে একটা কথা প্রচলিত ছিল এবং আমরাও সেই সাধারণ্যের অন্তর্গত যে, শরৎচন্দ্রকে অশ্লীল লেখক বিচারে সুনীতিপন্থী 'প্রবাসী' শরৎ-চন্দ্রের লেখাকে স্থান দেননি। কথাটা আমরা বিশ্বাস করতাম ; শরৎচন্দ্রের লেখা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হ'তেও দেখিনি।

নরেন্দ্র দেব তাঁর "সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র"-এ লিখেছেন ঃ

'প্রবাসী' পত্রিকা শরৎচন্দ্রের উপন্যাস প্রকাশের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও 'প্রবাসী'তে লেখবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করায় শরৎচন্দ্র প্রবাসীতে লেখা দিতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রবাসী থেকে যখন তাঁকে অনুরোধ করা হ'ল যে, তিনি যা লিখবেন তার একটি চুম্বক ক'রে যেন পূর্বাহ্নে তাঁহাদের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং তাঁরা সেটি মনোনীত করলে তবেই সে উপন্যাস 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হবে,—এ সর্তে শরৎচন্দ্র নিজেকে অপমানিত করতে রাজী হলেন না। একথা তিনি রবীন্দ্রনাথকে জানালেন। কবি শুনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে 'প্রবাসী'তে রচনা পাঠাতে তাঁকে বারংবার নিষেধ করেন। শরৎচন্দ্র তাই 'প্রবাসী'তে কোনো রচনা দেন নি।" (পৃপৃঃ ৭৯-৮০)।

(৩৮) শরৎ পরিচয়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম সং, পৃঃ ৬৫

'রবীন্দ্রজীবনীকার লিখেছেন : শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক অলীক কথা মুখে মুখে সাহিত্যিক ও অসাহিত্যিক মহলে চালু ছিল বরাবরই। নরেন্দ্রদেব 'সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র' নামক গ্রন্থের ২য় সংস্করণে প্রবাসীর সম্পাদক, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কতকগুলি সংবাদ সরবরাহ করেন। এতদ্‌সম্পর্কে শ্রীনিকেতনে থাকিতে কবি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে এক পত্র পান। তদুত্তরে তিনি (৯ই জুলাই ১৯৩৯) লিখিতেছেন, 'গল্প প্রকাশ করা নিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রবাসীর দ্বন্দ্ব ঘটেছিল সেই জনশ্রুতির উল্লেখ এই প্রথম আপনার পত্রে জানতে পারলুম। ব্যাপারটা যে সময়কার তখন শরতের সঙ্গে আমার আলাপ' ছিল না। অনেক অমূলক খবরের মূল উৎপত্তি আমাকে নিয়ে, এও তার মধ্যে একটি। এই জন্যে মরতে আমার সংকোচ হয়। তখন বাঁধ ভাঙা বন্যার মতো ঘোলাগুজবের স্রোত প্রবেশ করবে আমার জীবনীতে—আটকাবে কে?'

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী' মাসিকপত্রে শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর বিবিধ প্রসঙ্গে 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' শিরোনামায় লেখা হয়েছিল :

"সুপ্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। ··

"১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রসিদ্ধ ফরাসী গ্রন্থকার রম্যাঁ রলাঁর সহিত জেনিভার নিকটবর্তী ভিল্‌নভ্‌ গ্রামে প্রবাসী-সম্পাদকের সাক্ষাৎ হয়।...১৩৩৪ সালের জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে ৮ নং চিঠিতে লেখা হইয়াছিল, 'আমরা অবগত হইলাম, রলাঁ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদের ইটালীয় অনুবাদ পড়িয়াছেন। তিনি বলিলেন, শরৎচন্দ্র একজন প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক, এবং জিজ্ঞাসিলেন, তিনি আর কি কি বহি লিখিয়াছেন। আমি বলিলাম।'

"শরৎবাবুর সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় কখন হয় নাই, কিন্তু আমি তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিতও ছিলাম না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি সম্মান লইবার জন্য যখন তিনি ঢাকা যান, আমাকে তখন একটি কাজে ঢাকা যাইতে হইয়াছিল। সেই সময় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহার ছাত্র অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে ছিলেন। ঐ বাড়ীতে একদিন অনেকের নিমন্ত্রণ হয়। আচার্য্য রায় ও শরৎবাবু উপস্থিত ছিলেন। শরৎবাবু প্রথম কি প্রকারে

(৩৯) প্রবাসী ১৩৪৬ শ্রাবণ থেকে রবীন্দ্রজীবনীতে উদ্ধৃত। ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৭৫-৭৬।

আচার্য্য রায়ের নিকট পরিচিত হন, তখন গল্প করিয়াছিলেন। তাহা আমার অস্পষ্ট মনে আছে। শরৎবাবু বলিলেন, অনেক বৎসর আগে (যখন বোধ হয় তাঁহার চুল পাকে নাই এবং বয়স বাস্তবিক যাহা তাহা অপেক্ষা কম দেখাইত), তাঁহার এক বন্ধু তাঁহাকে আচার্য মহাশয়ের নিকট লইয়া যান। রায় মহাশয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পড়াশুনা কি কর?' (আচার্য মহাশয় বোধ হয় তাঁহাকে পোস্ট-গ্রাজুয়েট কোন ক্লাসের ছাত্র মনে করিয়াছিলেন)। এই প্রশ্নের উত্তরে শরৎবাবু জানাইলেন যে তিনি পড়াশুনা কিছুই করেন নাই। তাহাতে আচার্য মহাশয় বলিলেন, 'এর মধ্যেই লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছ?' তখন শরৎবাবুর যে বন্ধু তাঁহাকে আচার্য মহাশয়ের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, ইনি ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।' তাহা শুনিয়া আচার্য রায় তাঁহার যে যে বহি পড়িয়াছেন তাহার সম্বন্ধে নিজের মত বলিতে লাগিলেন।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টিতে

"শরৎবাবুর সহিত আমার একবার মাত্র কিছু দীর্ঘ কথোপকথন হইয়াছিল। তাহা লিখিয়া রাখি নাই এবং আমার স্মৃতিশক্তি আগেকার মত নাই। সামান্য কিছু মনে আছে। তিনি ঢাকা হইতে উপাধি লইয়া ফিরিবার পথে যে ষ্টীমারে আসিতেছিলেন, আমিও সেই ষ্টীমারে আসিতেছিলাম। তিনি প্রথম শ্রেণীর ক্যাবিন হইতে গল্প করিতে আসিলেন। একটি যুবক তাঁহার মাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় তাঁহার ভাইয়ের সহিত দেখা করিতে আসিতেছিলেন। ভাইটির কোন বৈপ্লবিক অভিযোগে কারাদণ্ড হইয়াছিল। শরৎবাবু বৈপ্লবিক সহিংস কার্যে সংশ্লিস্ট যুবকদের খুব একটা বৃহৎ সংখ্যার উল্লেখ করিলেন এবং তাহাদের জন্য খুব উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাহারা যাতে ঐরূপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয় এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন মনে পড়িতেছে। 'সভ্য' সমাজে সন্তান সংখ্যা হ্রাসের কৃত্রিম উপায় অবলম্বন ও বিজ্ঞাপনাদির দ্বারা তাহার প্রচার শরৎচন্দ্র নিন্দনীয় মনে করিতেন।

"জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্রনাথের বৈঠকখানার স্বতন্ত্র অট্টালিকা বিচিত্রা নামে পরিচিত। সেখানে আগে মধ্যে মধ্যে সাহিত্যিক আলোচনা হইত। একবার মুসলমানী বাংলা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তাহাতে শরৎবাবুও তাকিয়ার উপর অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় এক পায়ের উপর আর এক পা তুলিয়া

দিয়া দু-একটা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা কি সামান্য মনে আছে; কিন্তু ঠিক মনে না থাকায় লিখিলাম না।" ৪০

১৩৪৬এর জ্যৈষ্ঠ মাসে 'প্রবাসী'র 'বিবিধ প্রসঙ্গে' 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসাদির সমালোচনা' শিরোনামায় লেখা হয়েছিল: "জনৈক ভদ্রলোক (তাঁহার নাম ধাম বর্তমান নিবাস বলিব না) আমাদিগকে লিখিয়াছেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পাপ সাহিত্যের পাপরহস্যগুলি উদঘাটন করিবার চেষ্টা করিয়া কতকগুলি ধারাবাহিক সমালোচনা যদি লিখি তবে আপনি আপনার প্রবাসী পত্রিকায় তাহা প্রকাশ করিতে পারিবেন কিনা দয়া করিয়া আমাকে জানাইবেন।' তাঁহার মতে এরূপ সমালোচনা লেখা কেন আবশ্যক সে বিষয়ে তিনি অনেক কথা লিখিয়াছেন। তাহা উদ্ধৃত করিব না। তিনি আত্মপরিচয় দান প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে আছে যে, ব্রহ্মবিদ্যা পত্রিকায় তাঁহার অনেক লেখা বাহির হইয়াছে, এবং 'ভারতবর্ষ' ও 'বসুমতী'তেও তাঁহার লেখা বাহির হইয়াছে।

"পত্রলেখক মহাশয় আমার পরিচিত নহেন। তাঁহার চিঠি হইতে বুঝিলাম তিনি হিন্দু সমাজের লোক। সুতরাং উল্লিখিত তিনটি মাসিকের কোনটিতে তিনি শরৎ সাহিত্যের প্রতিকূল সমালোচনা পাঠাইলে তাহার সম্পাদক মহাশয় তাঁহার লেখা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-প্রসূত মনে করিতে পারিতেন না। আমি তাঁহার চিঠির উত্তরে চিঠি লিখিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা না করিয়া 'প্রবাসী'তেই এ বিষয়ে আমার বক্তব্য জানাইতেছি; কারণ তাহাতে এরূপ বিষয়ে আমার মত সমালোচনেচ্ছু অন্য লেখকেরাও জানিতে পারিবেন।

"শরৎবাবু যখন জীবিত ছিলেন, তখন তাঁহার কোন বহির প্রতিকূল সমালোচনা আমাদের নিকট আসিয়াছিল। তাহা আমরা ছাপি নাই। ছাপিলে, আমরা সাম্প্রদায়িক বা ব্যক্তিগত কারণে তাঁহার নিন্দা রটাইতেছি, এই অপরাধ রটিত এবং সমালোচনার সত্যতা-অসত্যতা নির্দ্ধারণে তাহাতে বাধা জন্মিত। সেই কারণে এখনও প্রতিকূল সমালোচনা ছাপিব না। উল্লিখিত পত্রলেখক মহাশয় যখন তিনটি মাসিকে লিখিয়া থাকেন, তখন তাঁহার অভিপ্রেত ধারাবাহিক সমালোচনা ঐ কাগজগুলির কোনটিতে প্রকাশ করিলে, যদি তাঁহার সমা-

(৪০) প্রবাসী, ১৩৪৪, ফাল্গুন, পৃঃ ৭৪৫, বিবিধ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

লোচনা সত্য হয়, তাহা হইলে তাহা বাস্তবিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পাঠকদের সেরূপ বাধা জন্মিবে না যেরূপ বাধা জন্মিবে 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করিলে।

"শরৎবাবুর কোন কোন বহির প্রতিকূল সমালোচনা আমাদের না-ছাপিবার আর একটি কারণ এই যে, তাঁহার যে-যে বহির নিন্দা আমরা শুনিয়াছি সে বহিগুলি বাস্তবিক নিন্দনীয় কিনা প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে তাহা বলিতে পারি না, কারণ সে গুলি আমরা পড়ি নাই।

"১৩৪৪ সালের ২০শে চৈত্র তারিখের 'যুগান্তর' কাগজে শ্রীযুক্ত প্রবোধ কুমার সান্যালকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। চিঠিটির প্রধান বিষয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাহার শেষ অনুচ্ছেদ এই :—

'কোনো কোনো মানুষ আছে, প্রত্যক্ষ পরিচয়ের চেয়ে পরোক্ষ পরিচয়েই যারা বেশি সুগম। শুনেছি শরৎ সে জাতের লোক ছিলেন না, তাঁর কাছে গেলে তাঁকে কাছেই পাওয়া যেত। তাই আমার ক্ষতি রয়ে গেল। তবু তাঁর সঙ্গে আমার দেখাশোনা কথাবার্তা হয়নি যে তা নয়, কিন্তু পরিচয় ঘটতে পারল না। শুধু দেখাশোনা নয়, যদি চেনাশোনা হত তবে ভালো হোত। সমসাময়িকতার সুযোগটা সার্থক হোত। হয়নি, কিন্তু সেই সময়টাতেই বিস্মিত আনন্দে দূরের থেকে আমি পড়ে নিয়েছি তাঁর বিন্দুর ছেলে, বিরাজ বৌ, রামের সুমতি, বড়দিদি। মনে হয়েছে কাছের মানুষ পাওয়া গেল। মানুষকে ভালোবাসার পক্ষে এই যথেষ্ট।'

"রবীন্দ্রনাথের লেখা এই কথাগুলি হইতে বুঝা যায় যে শরৎ বাবুর যে-যে বহির নিন্দা শোনা যায়, কবি তাহার একখানাও পড়েন নাই।

"আমাদের মনে হয়, শরৎ বাবুর গ্রন্থগুলির ঠিক সমালোচনার সময় এখনও আসে নাই। তাঁহার কোন একখানা বহি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নাই, এমন নয়। কিন্তু আমরা স্বয়ং তাহার কোন সমালোচনা করিব না, অন্যের সমালোচনাও ছাপিব না।

"অবশ্য, তিনি কিংবা তাঁহার প্রকাশকেরা তাঁহার কোন বহি সমালোচনার জন্য যদি পাঠাইতেন, তাহা হইলে তাহা সমালোচিত হইত।"৪১

সুতরাং, সন্দেহ থেকেই যায় যে, শরৎচন্দ্রের ও শরৎসাহিত্যের সঙ্গে 'প্রবাসী'র প্রীতির সম্পর্ক ছিল না। প্রবাসী সম্পাদক কোন কোন জায়গায়

(৪১) প্রবাসী, ১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠ, বিবিধ প্রসঙ্গ, পৃপৃঃ ২৮২-৮৩।

প্রখর স্মৃতিশক্তির পরিচয় দিয়েছেন, কোথাও কোথাও হৃতস্মৃতিশক্তির কথা বলেছেন। কোন্ বাড়ীতে কোথায় কি উপলক্ষে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হয়েছে এবং আচার্য রায়ের শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কিভাবে পরিচয় ও কি কথা হয়েছিল বিশদ বলেছেন। সেখানে বিতর্কের অবকাশ নেই। কিন্তু শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কি কথোপকথন হয়েছে তা প্রবাসী সম্পাদকের মনে নেই; যা সামান্য মনে আছে তাও প্রসঙ্গান্তর। বিচিত্রাভবনে শরৎচন্দ্র তাকিয়ার উপর অর্ধশায়িত অবস্থায় এক পায়ের উপর আর এক পা তুলিয়া দিয়া দু একটা মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন সে চিত্রটি হুবহু মনে আছে, মনে ছিল না কি মন্তব্য শরৎচন্দ্র করেছিলেন।

সেকালে 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখের একটি সুনীতি সঙ্ঘ ছিল এবং শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও তদ্ভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁদের দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র আবির্ভাবকাল থেকেই অপাঙ্‌ক্তেয় অশ্লীল ব'লে পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। তবে 'প্রবাসী' সম্পাদকের নীতি-নিষ্ঠা সম্পর্কে কারও দ্বিমত ছিল না এবং এজন্য তিনি বহু বিদ্বজ্জনের শ্রদ্ধার পাত্রও ছিলেন। সেই কারণেই, যে-ভদ্রলোক শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের পাপ সাহিত্যের পাপ রহস্যগুলি 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় উদ্ঘাটন-প্রার্থী হয়ে ছিলেন তিনি স্বভাবতই প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন, কারণ—

(১) শরৎবাবুর জীবদ্দশায় তাঁর একটি বইয়ের প্রতিকূল সমালোচনা এসেছিল, 'প্রবাসী' তা ছাপেন নি; শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরেও তা ছাপবেন না।

(২) শরৎবাবুর যে বইগুলির নিন্দা তিনি শুনেছেন সেগুলি সত্যি নিন্দনীয় কি না তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রবাসী সম্পাদকের নেই, কেন না, তিনি সেগুলি পড়েন নি।

(৩) কবি ও (রবীন্দ্রনাথ) নিন্দিত বইগুলি যে পড়েন নি 'যুগান্তরে' প্রকাশিত এক চিঠির উদ্ধৃতি থেকে তিনি এই উপসংহার করেছেন।

(৪) শরৎবাবুর গ্রন্থগুলির ঠিক সমালোচনার সময় এখনও আসেনি; দুই-একখানা তিনি না পড়েছেন এমন নয় কিন্তু তিনি স্বয়ং তার সমালোচনা করবেন না, অন্যের সমালোচনাও ছাপবেন না।

অর্থাৎ, অকথিত কোন কারণে শরৎ সাহিত্য আলোচনা প্রবাসীতে প্রায় নিষিদ্ধ। তবে, যদি শরৎচন্দ্রের প্রকাশক বা শরৎচন্দ্র সমালোচনার জন্য বই পাঠাতেন, 'প্রবাসী'তে সমালোচিত হ'ত এই আশ্বাস তিনি দিয়েছেন।

কিন্তু শরৎ সাহিত্য সমালোচনাই যেখানে নিষিদ্ধপ্রায় সেখানে শরৎচন্দ্রের

রচনা প্রবেশাধিকার পায়নি অথবা প্রবেশোদ্যত হয়নি প্রবাসী সম্পাদক না বললেও কারণটা অনুমান করা যায়। আর, শরৎচন্দ্রের একটা লেখাও 'প্রবাসী'তে কখনো স্থান পায় নি এই কি শরৎচন্দ্রের রচনার প্রতি 'প্রবাসী' সম্পাদকের প্রতিকূল মনোভাবের সব চাইতে বড সাক্ষ্য নয় ?

কিন্তু 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অকাট্য প্রমাণে নরেন্দ্রনাথ দেবের অভিযোগ সর্বতোভাবে খণ্ডন করেছেন।

'প্রবাসী', শ্রাবণ, ১৩৪৬-এর 'বিবিধ প্রসঙ্গে "শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও প্রবাসী" শিরোনামায় আছে ঃ

"শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব প্রণীত 'সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র' নামক পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের ৭৯ ও ৮০ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত বাক্যগুলি দেখিলাম।

উদ্ধৃতিটি ইতিপূর্বেই দিয়েছি।

"ইতিপূর্বে (১৩৪৬ সালের ২৩শে আষাঢ়ের পূর্বে) এই বহিখানি ও ইহাতে লিখিত এই কথাগুলি আমি দেখি নাই। এই জন্য ইতিপূর্ব্বে এগুলির প্রতিবাদ করি নাই। ২৩শে আষাঢ ইহার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

"আমি চিঠি লিখিয়া বা মৌখিক শরৎবাবুকে কস্মিন্ কালেও 'প্রবাসী'তে লিখিতে অনুরোধ করি নাই, কাহারও মারফৎও তাঁহাকে অনুরোধ করি নাই। তাঁহার উপন্যাস 'প্রবাসী'তে প্রকাশের জন্য কখনও আগ্রহ প্রকাশও করি নাই। সুতরাং, 'তিনি যা লিখবেন তার একটি চুম্বক ক'রে পূর্বাহ্ণে' আমাকে পাঠাইতেও কখনও বলি নাই।

"রবীন্দ্রনাথ যে তাঁহাকে 'প্রবাসী'তে লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন ও পরে বারংবার নিষেধ করেন, ইহা আমি পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। সেইজন্য, এই খবর সত্য কিনা জানিবার নিমিত্ত কবিকে আমি চিঠি লিখিয়াছিলাম। তাহার উত্তরে লিখিত তাঁহার চিঠিটি নীচে মুদ্রিত হইল।

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

গল্প প্রকাশ করা নিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রবাসীর দ্বন্দ্ব ঘটেছিল সেই জনশ্রুতির উল্লেখ এই প্রথম আপনার পত্রে জানতে পারলুম। ব্যাপারটা যে সময়কার তখন শরতের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না। অনেক অমূলক

খবরের মূল উৎপত্তি আমাকে নিয়ে, এও তার মধ্যে একটি। এই জন্যে মরতে সঙ্কোচ হয়। তখন বাঁধভাঙা বন্যার মতো ঘোলা গুজবের স্রোত প্রবেশ করবে আমার জীবনীতে—আটকাবে কে?

আপনাদের

'৯৷৭'৩৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই কাল্পনিক ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছি এবং রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, প্রবাসীতে শরৎবাবুর উপন্যাস প্রকাশের জন্য আমার আগ্রহ প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথের তাঁহাকে প্রবাসীতে লিখিতে অনুরোধ, শরৎবাবুকে তাঁহার উপন্যাসের চুম্বক পূর্ব্বাহ্নে আমাকে পাঠাইতে বলা, তাহাতে তাঁহার অপমানিত বোধ করা ও রবীন্দ্রনাথের ক্ষুণ্ণ হওয়া এবং শরৎবাবুকে রবীন্দ্রনাথের, একবার নয়, বারংবার প্রবাসীতে লিখিতে নিষেধ করা—সর্ব্বৈব মিথ্যা।

"এই কাল্পনিক ঘটনাবলীর উৎপত্তি সম্বন্ধে আমি কিছু সত্য কথা লিখিতে পারিতাম। কিন্তু লিখিতে গেলে যাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতে হইত, তাঁহারা পরলোকে, সুতরাং তাঁহাদের সহিত মোকাবিলার উপায় নাই। অতএব, এইখানেই ইতি। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।"

অথচ 'প্রবাসী'র সঙ্গে দীর্ঘকাল ওতপ্রোতভাবে জড়িত, 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্ত দাস তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে নানা বিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের এক জায়গায় বলেছেন: "দুঃখের বিষয়, আমাদের পরস্পর ঘনিষ্ঠতা তখন খুবই বাড়িয়াছে; আমরা অর্থাৎ অশোক চট্টোপাধ্যায় কালিদাস নাগ ও আমি ঘন ঘন ট্রেনযোগে ও ও পদব্রজে দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়-পানিত্রাস-ভবনে যাতায়াত করিতেছি এবং যে শরৎচন্দ্রের মূল বাংলা রচনা-নৈতিক কারণে একদা 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় স্থান পায় নাই, তাঁহারই অশোক চট্টোপাধ্যায়-কৃত ইংরেজী অনুবাদ সাদরে 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় মুদ্রিত করিতেছি। পিতার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত পুত্র করিতেছেন।" ৪২

(৪২) আত্মস্মৃতি, শ্রীসজনীকান্ত দাস, অগ্রাহায়ণ ১৩৬১, ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

রবীন্দ্রনাথের চিঠি

শ্রীপ্রবোধ সান্যালকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের যে চিঠিখানির কথা 'প্রবাসী' ও রবীন্দ্র জীবনীকার উল্লেখ করেছেন তা দেখছি প্রথমে বেরিয়েছিল 'ভারতবর্ষে' (চৈত্র ১৩৪৪); পরে 'যুগান্তর'-এর সাময়িকীতে (পৃঃ ১৮), ইংরাজি ২রা এপ্রিল, ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ এবং বাংলা ১৩৪৪ সাল, ২০এ চৈত্র, রবিবার। 'যুগান্তর'-এর এটি প্রথম বর্ষ। সম্পাদক যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং বেরোত ভ্যান্সিটার্ট-রো থেকে।

'যুগান্তর সাময়িকীর' 'প্রতিধ্বনি' শিরোনামায়, নাম ৺শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চিঠিটি এই:

কল্যাণীয়েষু

তোমার অনুরোধটি আমার পক্ষে সহজে স্বীকার্য নয় একটু চিন্তা করলেই তা বুঝতে পারবে। তার প্রধান কারণ দাবি চারদিক থেকে এসেছে, অনেককে নিরাশ না করলে একজনের আশা পূর্ণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। অর্থাৎ পুণ্য যতটুকু অর্জন করব অপরাধের পরিমাণ তার চেয়ে অনেক বেশি হয়ে পড়বে অথচ হরির লুঠের মতো চারদিকে রচনার হালকা বাতাসা ছড়িয়ে দেওয়া আমার অভ্যস্ত নয়। সকলের চেয়ে বড় বিঘ্নরূপে সাতাত্তর বছরের উপর জয়ধ্বজা উঁচিয়ে বসে আছে জরা, কর্মের পথে যেটুকু বরাদ্দ সে মঞ্জুর করেছে সেটার উপর নির্ভর করে নিমন্ত্রণের আয়োজন করতে লজ্জা বোধ করি। মহাকাল হঠাৎ এক সময়ে কৃপণ গবর্মেন্টের মতো বেতন লাঘব করতে আরম্ভ করে, আমার উপর সম্প্রতি সেই বিধান ঝুলানো হয়েছে। এতদিন যাদের মুঠো ভ'রে দিতে পেরেছি আজ তারা ক্ষমা করে না।—কৃপণতা যে আমার নয়, কৃপণতা কালেরই, সে কথা তারা কিছুতেই মানতে চায় না, কেন না কালকে গাল দিলে সে তার গায়ে লাগে না। সেইজন্যই শরতের মৃত্যুতে একখানি সর্বজনীন চৌপদী পাঠিয়ে দেওয়ার বেশি আর কিছু করতে পারিনি। আমার কাছ থেকে শরতের যে প্রশস্তি পাওনা ছিল নিতান্ত অবি-বেচকের মতো শরতের মৃত্যুর পূর্বেই তা অকৃপণ লেখনীতেই সেরে রেখেছি; আমার মৃত্যুর পরে শরৎ এই কথাটি সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবেন, বোধ করি এই লুব্ধ আশা মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। আমার ভাগ্যে উল্টোটাই ঘটে, তাই আমার জীবিতকালে অকারণে অসহিষ্ণু হয়ে আমার প্রতি শরৎ

অবিচারই করেছেন—যদি ঠিক সময়মতো মরতে পারতুম তাহলে নিঃসন্দেহেই যথোচিতভাবে সেই গ্লানিটা মার্জনা করে যেতেন। শরতের জন্য তোমাদের শোককৃত্য যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আমার পক্ষের এই কথাটা মনে রেখো যে, আমি যখন বিদায় নেব তখন শরৎ থাকবেন না। আমার জীবন-রঙ্গভূমিতে যবনিকা পতনের সময় আসন্ন, এখন থেকেই ভেবে দেখো বড়ো আওয়াজের হাততালিটা পাওয়া যাবে কার কাছ থেকে। একটা ভালো-মতো তালিকা যদি পাঠিয়ে দাও তবে সেইটে চোখের সামনে রেখে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করব। ইতিমধ্যেই যতটা পরিচয় পাওয়া গেছে তাতে মরতে রুচি হয় না।

"আমার আয়ুকালের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে পরে পরে তিনটে পর্ব দেখা দিয়েছে। আমি যখন আসরের জাজিমটার একধারে জায়গা করে নিয়েছিলুম, তখন কবির উচ্চ আসনে ছিলেন হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সিংহাসনে, মধুসূদন বিদায় নিয়ে গেছেন। এঁরা চলে যাবার কিছু পূর্ব থেকে দ্বিতীয় পর্বের শুরু হয়েছিল। প্রথম পর্বে আমি ছিলুম সকলের চেয়ে বয়সে ছোটো, দ্বিতীয় পর্বে সকলের চেয়ে বয়সে বড়ো। তার ফল হয়েছিল সাহিত্যিকদের সঙ্গে আমার বয়স্যতার সম্বন্ধ ঘটতে পারে নি। একলা পড়ে গিয়েছিলুম। সৌভাগ্যক্রমে অকৃত্রিম শ্রদ্ধার গুণে বয়সের বাধা পেরিয়ে সত্যেন্দ্র আমার কাছে আসতে পেরেছিলেন। তাই কাব্যের সঙ্গে মানুষের পরিচয় মিলতে পেরেছিল। এই দুয়ের মিলনে আমি যে রস পেয়েছিলেম সেটাকে আমি মস্ত লাভ ব'লে মনে করি। আমার বিশ্বাস মানুষরূপে তিনি আমার কাছে আসাতে কবিরূপে তিনিও আমাকে বেশি সত্য করে পেয়েছিলেন।

"তৃতীয় পর্বের আরম্ভ হয়েছে শরৎকে নিয়ে। আধুনিকের সঙ্গে তাঁর যেমন নৈকট্য ঘটেছে তাঁর পূর্ববর্তীদের আর কারো তেমন ঘটে নি। তিনি সম্পূর্ণভাবেই নিজের দেশের এবং কালের। এটা সহজ কথা নয়। এটা শুনতে স্বতবিরোধী, কিন্তু দেখা যায়, কৃত্রিমতা সহজ, স্বাভাবিক হওয়াই সহজ নয়। তেমনি নিজের দেশকালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলে যাওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটেনা। সকলেই যে নিজের দেশে কালে জন্মগ্রহণ করে তা নয়। জন্মবিধাতা জাতককে স্থান নির্ণয় করে দেবার উপলক্ষে সব সময়ে বর্তমানের সময় নির্ণয় করে চলেন না, সাহিত্যে তার ফলাফল হয় বিচিত্র। যথোচিত দেশকাল থেকে চিরনির্বাসনে যারা জন্মেছে

এমন লোকের অভাব নেই। সৃষ্টিবৈচিত্র্যের জন্যে তারও প্রয়োজন আছে।

বলা কওয়া নেই, শরৎ হঠাৎ এসে পৌঁছলেন বাংলাসাহিত্যমণ্ডলীতে। অপরিচয় থেকে পরিচয়ে উত্তীর্ণ হোতে দেরি হোলো না। চেনা শোনা হবার পূর্ব থেকেই তিনি চেনা মানুষ হয়ে এসেছেন। দ্বারী তাঁকে আটক করেনি। সাহিত্যে যেখানে পাঠকদের চিত্ত-পরিচয় এবং লেখকের আত্ম-পরিচয় অব্যবধানে এক সঙ্গে ঘটে, সেখানে এই রকমই হয়—পূর্বরাগ আর অনুরাগের মাঝখানে সময় নষ্ট হয় না।

"সেই সময়টাতে কর্মের টানে এবং বয়সের ভেদে আমি দূরে পড়ে গেছি। ছেড়েই দিয়েছি কলকাতায় বাস। আমার সম্বন্ধে দেশে নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনা চলছিল, অধিকাংশ সময়ে তা সত্যও নয়, প্রিয়ও নয়। আমাব মন তাই দূরে চলে এসেছিল। এই সময়েই শরতের অভ্যুদয়। শান্তির জন্যে যে নিভৃত কোন আশ্রয় ক'রে আপন কর্মের বেষ্টনে গা-ঢাকা দিয়েছিলুম, সেখান থেকে শরতের সঙ্গে কাছাকাছি মেলবার কোনো সুযোগ হোলো না।

"কোনো কোনো মানুষ আছে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের চেয়ে পরোক্ষ পরিচয়েই যারা বেশি সুগম। শুনেছি শরৎ সে জাতের লোক ছিলেন না, তাঁর কাছে গেলে তাঁকে কাছেই পাওয়া যেত। তাই-আমার ক্ষতি রয়ে গেল। তবু তাঁর সঙ্গে আমার দেখাশোনা কথাবার্তা হয়নি যে তা নয়, কিন্তু পরিচয় ঘটতে পারল না। শুধু দেখা শোনা নয় যদি চেনা শোনা হোত তবে ভালো হোত। সমসাময়িকতার সুযোগটা সার্থক হোত। হয়নি, কিন্তু সেই সময়টাতেই বিস্মিত আনন্দে দূরের থেকে আমি পড়ে নিয়েছি তাঁর বিন্দুর ছেলে, বিরাজ বৌ, রামের সুমতি, বড়োদিদি। মনে হয়েছে কাছের মানুষ পাওয়া গেল। মানুষকে ভাল বাসার পক্ষে এই যথেষ্ট।" ৪৩

কৌতুক এই, এই 'যুগান্তর' সংখ্যায় যে বই থেকে 'প্রবাসী'-শরৎচন্দ্র বিতর্কের উদ্ভব নরেন্দ্রদেবের সেই 'সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র' বইটির সমালোচনাও তার ১৬ পৃষ্ঠায় বেরিয়েছে এবং বইখানির ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে।

মৃত্যুর চার মাস আগে শেষ জন্মদিন উপলক্ষে বেতার অফিসে শরৎচন্দ্রের ভাষণটি নির্মম নিয়তির হস্তাবলেপে বড়ই করুণ হয়ে আছে। নরেন্দ্রদেব তাঁর 'সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র'-এ লিখেছেন ঃ

(৪৩) শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালকে লিখিত, ভারতবর্ষ, চৈত্র, ১৩৪৪

বেতার অফিসে শরৎচন্দ্র

"বেতার অফিসে প্রতি বৎসর ৩১শে ভাদ্র শরৎচন্দ্রের জন্মতিথি উপলক্ষে 'শরৎ-শর্বরী' নামে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন হ'ত। গত ভাদ্রেও তাঁর দ্বিষষ্টিতম জন্মদিন উপলক্ষে তাঁরা একটি আনন্দ আসর আহ্বান করেছিলেন। শরৎচন্দ্র এই আসরে তাঁর অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন —"বাষট্টি বৎসর বয়সে পা দিয়ে আমার জন্মতিথি উপলক্ষে সকলের কাছে আশীর্বাদ চেয়ে নেবার পূর্ব্বে আমার গুরুদেব বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, যিনি আজ রোগশয্যায়, তাঁকে প্রণাম করি। এ জগতে সাহিত্য-সাধনায় তাঁর আশীর্বাদ, এটি শুধু আমারই নয়, প্রতি সাহিত্যিকের পরম সম্পদ। সেই আশীর্বাদ আমি আজকের দিনে চেয়ে নিলাম।

"নিজের সাহিত্য সাধনার ব্যাপার নিজের মুখে কিছু বলা যায় না। শুধু এইটুকু ইঙ্গিতে বলতে পারি যে, অনেক দুঃখের মধ্য দিয়ে সাধনায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছি। কোনোদিন মনে করিনি যে আমি সাহিত্যিক হবো বা কোনো বই আমার কোনো দিন প্রকাশিত হবে। যা লিখেছি, তাও সংকোচে দ্বিধায় পরের নামে। তার কোনো মূল্য আছে কিনা ভাবতে পারিনি। তারপর দীর্ঘকাল, বোধ হয় এমন পনরো যোলো বৎসর, সাহিত্যচর্চ্চার ধার দিয়েও যাই নি। ভুলেও মনে হত না যে আমি কোনোদিন লিখেছি। তারপর নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে আবার এই জীবন; এইটিই হয়ত আমার সত্যকার জীবন। অন্তত ভগবান বোধ হয় এই জীবনটা আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট ক'রে রেখেছিলেন। তাই ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও ঘুরে ফিরে আবার এরি মধ্যে এই একষট্টিটা বছর আমাকে কাটাতে হোলো। আমি আপনাদের মাঝে বেশিদিন থাকি বা না থাকি আমার একথাটা হয়ত আপনাদের মাঝে মাঝে মনে পড়বে যে, তিনি বলে গেছেন যে, অনেক দুঃখের মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্য-সাধনা ধীরে ধীরে বাধা ঠেলে চলেছিল।" (পৃপৃঃ ৯৬-৯৭)

কথাটা আরও এই কারণে করুণ যে, শরৎচন্দ্র নিজেই তাঁর আত্মকথায় সগৌরবে বলেছিলেন: I am the only fortunate writer who has not had to struggle—বাঙলাদেশে বোধ হয় আমিই একমাত্র সৌভাগ্যবান্ লেখক যাকে কোনদিন বাধার দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়নি।

"১৯২২ সনে অক্সফোর্ড-ইউনিভার্সিটি হইতে প্রথম পর্ব্ব 'শ্রীকান্ত'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করেন—K. C. Sen ও Theo-

dosia Thomson, ইহার ভূমিকায় E. J. Thomson ইংরেজী বিবৃতিটি উদ্ধৃত করেন।

'My childhood and youth were passed in great poverty. I received almost no education for want of means. From my father I inherited nothing except, as I believe, his restless spirit and his keen interest in literature. The first made me a tramp and sent me out tramping the whole of India quite early, and the second made me a dreamer all my life.—

"আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্রের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থের অভাবেই আমার শিক্ষালাভের সৌভাগ্য ঘটেনি। পিতার নিকট হতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকারসূত্রে আর কিছুই পাই নি। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘরছাড়া করেছিল—আমি অল্প বয়সেই সারা ভারত ঘুরে এলাম। আর পিতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবনভরে আমি কেবল স্বপ্ন দেখেই গেলাম। আমার পিতার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা—এক কথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনটাই তিনি শেষ করতে পারেন নি। তাঁর লেখাগুলি আজ আমার কাছে নেই—কবে কেমন করে হারিয়ে গেছে, সে কথা আজ মনে পড়ে না। কিন্তু এখনও স্পষ্ট মনে আছে, ছোটবেলায় কতবার তাঁর অসমাপ্ত লেখাগুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। কেন তিনি এগুলি শেষ করে যান নি, এই বলে কত দুঃখই না করেছি। অসমাপ্ত অংশগুলি কি হতে পারে, ভাবতে ভাবতে আমার অনেক বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে। এই কারণে বোধ হয় সতের বৎসর বয়সের সময় আমি গল্প লিখতে সুরু করি। কিন্তু কিছুদিন বাদে গল্প-রচনা অকেজোর কাজ মনে করে আমি অভ্যাস ছেড়ে দিলাম।......

১৯১৩ সনের কথা

"আঠার বৎসর পরে একদিন লিখতে আরম্ভ করলাম। কারণটা দৈব দুর্ঘটনারই মত। আমার গুটিকয়েক পুরাতন বন্ধু একটি ছোট মাসিক পত্র বের করতে উদ্যোগী হলেন।...বিস্তর চেষ্টায় তাঁরা আমার কাছ থেকে লেখা পাঠাবার কথা আদায় করে নিলেন। এটা ১৯১৩ সনের কথা। আমি নিমরাজী হয়েছিলাম। কোনরকমে তাঁদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যেই আমি লেখা দিতেও স্বীকার হয়েছিলাম। উদ্দেশ্য, কোনরকমে

একবার রেঙ্গুন পৌঁছতে পারলেই হয়। কিন্তু চিঠির পর চিঠি আর টেলিগ্রামের তাড়া আমাকে অবশেষে সত্যসত্যই আবার কলম ধরতে প্ররোচিত করল। আমি তাঁদের নবপ্রকাশিত 'যমুনা'র জন্য একটি ছোট গল্প পাঠালাম। এই গল্পটি প্রকাশ হতে না হতেই বাঙলার পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করল। আমিও একদিনেই নাম ক'রে বসলাম। তারপর আমি অদ্যাবধি নিয়মিত লিখে আসছি। বাঙলা দেশে বোধ হয় আমিই একমাত্র সৌভাগ্যবান্...ইত্যাদি।"৪৪

শরৎচন্দ্রের চিত্তের যে অস্থিরতা তা উত্তরাধিকারসূত্রে যদি হয়েও থাকে, দোষগুণের বংশানুক্রমিকতা নিয়ে বিতর্কে যাওয়া নিরর্থক, রবীন্দ্রনাথের পট-ভূমিকায় দেখলে বলা যায়, অপরিসীম দারিদ্র্য জাতকের অস্থিরতাকে নিদারুণতর করে তুলেছে। উদাসীন স্বামী ও দুরন্ত পুত্রের গ্রাসাচ্ছদনের ভার অবশ্যই মমতাময়ী ভুবনেশ্বরী নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, কি ক'রে সেই অন্নসংস্থান হ'ত তিনি ছাড়া আর কেউ জানতেন না। শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলালের বৈষয়িক মতি ছিল না; সুতরাং, ভুবনেশ্বরীকেই অন্নহীন স্বামীর ভিটে থেকে নিজ পিত্রালয়ে আসতে হয়েছে; ছেলের রাতে পড়ার তেল জোগাতে পারেন নি। এই অবস্থায় লালিত শরৎচন্দ্রের মাঝে মাঝে এই নিষ্ঠুর বৈষম্যময় জগতের প্রতি বা ব্যক্তির প্রতি যদি কোন বিতৃষ্ণা জেগে থাকে তো তার মূলে নিঃসন্দেহে রয়েছে শৈশব কৈশোর তারুণ্যে অতলস্পর্শী দৈন্য। আর যদি তাঁর স্বীয় চরিত্রে এবং তাঁর সৃষ্টিরাজ্যের চরিত্রে স্নেহ-মমতার স্নিগ্ধ স্পর্শ থেকে থাকে তবে তাঁর মূলে রয়েছেন সর্বংসহা ধরিত্রীসমা জননী ভুবনেশ্বরী। "অনেক দুঃখের মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্য সাধনা ধীরে ধীরে বাধা ঠেলে চলেছিল" এই বিপরীত কথাটির যদি কোন অর্থ থাকে তো সেই প্রারম্ভিক দুঃস্থ জীবন।

পক্ষান্তরে

পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথকে বাস্তুভিটাহীন মাতুলালয়ের বন্ধন-দশা স্পর্শ করেনি, সমস্যা যা ছিল তা 'ভৃত্যরাজকতন্ত্রে'র এবং কাব্য চর্চায় প্রশ্রয় দিয়েছেন স্বয়ং পিতা: 'দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত, তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা তাই তখন আমাকেই সে কাজ করিতে

(৪৪) শঃ সাঃ সঃ, ৪ সম্ভার, পৃপৃঃ ৪১৯-২১।

হইবে। এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচ-শ টাকার চেক আমার হাতে দিলেন।' রবীন্দ্রনাথের এক ভাগ্নে জ্যোতিঃপ্রকাশ রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সাত-আট বছরে কবিতা লেখানোয় উৎসাহিত করেছিলেন। বাড়ীতে নানা বিদ্যার আয়োজন ছিল। শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল কখনো সস্নেহ আঙুল বাড়িয়ে ছেলেকে নিয়ে কোথাও ঘুরেছেন কিনা জানা যায় না, দেবেন্দ্রনাথ রবিকে নিয়ে হিমালয় যাত্রাও করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যে একটি সুশৃঙ্খল নিয়ম প্রণালীর মধ্যে বড় হয়েছেন তার প্রত্যেকটিই শরৎচন্দ্রের জীবনে অনুপস্থিত ছিল। মায়ের অযাচিত স্নেহাঞ্চল ছাড়া যাঁর প্রতিটি ক্ষণ ছিল প্রতিকূলতার কণ্টকক্ষত, তাঁর মানসিকতায় স্থৈর্য ও সংযম মাত্রাতিরিক্ত প্রত্যাশা। শরৎচন্দ্র অমল হোমের বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের যে সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, শরৎচন্দ্রের অন্তরে নিঃস্ব মায়ের স্নেহস্তন্য ছাড়া সে সৌন্দর্য বিকশিত হবার অন্য কোন উপকরণই ছিল না।

শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মনৈশ্বর্য তৌলদণ্ডে নিরিখ করার সময় এই কথাটি বিচারকের কখনোই বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। দারিদ্র কখনো কাউকে মহান্ করে না, করে পুত্র পৌত্রে হস্তান্তরিত তেজ; শরৎচন্দ্রের পিতামহ ছিলেন অসাধারণ তেজস্বী পুরুষ যেমন ছিলেন বিদ্যাসাগরের পিতামহ। তাঁরা ঋষি-দৃষ্টিতে দেখেছিলেন এঁদের জন্ম। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্য, আশ্রম, স্বদেশ, মানব ও বিশ্বচেতনারও উর্ধে ভগবদ্বিশ্বাসের পরিবেশে জীবনচর্যা; আর, পিতৃমাতৃগৃহহীন সর্ববন্ধন বা শাসনমুক্ত শরৎচন্দ্রের তামাক-আফিম-পানাসক্তির বোহেমিয়ান বেপরোয়া জীবন—দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান দুস্তর; সর্ববিধ আচরণে তাই পার্থক্যও বিস্তর। অথচ একটা সুস্পষ্ট সুনিশ্চিত সেতুবন্ধ ছিল হৃদয়বত্তা, মানুষের প্রতি ভালবাসা—অবিচল বিশ্বাস। এইখানে তাঁরা কাছাকাছি, অতি নিকট আত্মীয়, এক গোত্রান্তর্গত, স্রষ্টা, শিল্পী, সুরুচি-সম্মত রূপকার। বিস্ময়কর—কিন্তু সত্য।

চন্দ্রগ্রহণ

বাঙলাদেশে অকালমৃত্যুই বেশি, বিদ্যাসাগর বা রবীন্দ্রনাথের আয়ু নিয়ে এসেছেন কম প্রতিভাবানই। মৃত্যুর আগে শরৎচন্দ্র বেতার অফিসে যে ভাষণ দেন তাতেই বলেছেন, বাষট্টি বছরে পা দিয়ে তিনি "সকলের কাছে আশীর্বাদ চেয়ে নেবার পূর্বে" রোগশয্যায় শায়ী "তাঁর গুরুদেব বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম জানাই।" সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে বলেন, "এরি মধ্যে এই একষট্টিটা বছর আমাকে কাটাতে হোলো।" শরৎচন্দ্রের মনে মৃত্যুর

ছায়াপাত হয়েছে এবং কথাগুলোও তাই সেই অনুপাতে বিষণ্ণ। নরেন্দ্র দেব তাঁর 'সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র'-এ বলেছেন।

"প্রায় বৎসরাধিক কাল শরৎচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না।" বলা যায়, চিকিৎসা-সঙ্কটও চলছিল। প্রথমে সর্দি গর্মির চিকিৎসা। মাথার যন্ত্রণা। চশমা বদল করলেন। অল্প অল্প জ্বরের জন্য ম্যালেরিয়া চিকিৎসা। তারপর বিকোলাই প্রতিপন্ন। জ্বর গেল, শরীর ভাল হয় না। পাকাশয়ের পীড়া। ডাক্তারদের মতে ডিস্‌পেপসিয়া। চিকিৎসা সত্ত্বেও বাড়তেই লাগল। নানারকম চিকিৎসা। দেশে ফিরে আবার কলকাতায়। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বললেন, ও ডিস্‌পেপসিয়া নয়। সম্ভবত kink। এক্সরেতে ধরা পড়ল—যকৃতে ক্যানসার, বিস্তৃতিলাভ করেছে পাকস্থলী পর্যন্ত। অস্ত্রোপচারই সিদ্ধান্ত···কিন্তু তা করা নিয়ে নানা সমস্যা। তামাক ও আফিম না খেতে দেওয়ায় এক নার্সিং হোম ছেড়ে এলেন। শরীরের অবস্থা কাহিল, ছুরি ধরতে সাহস পান না সার্জেনরা, শরীরে কিছু খাদ্য চাই। মুখ দিয়ে অসম্ভব। গ্লুকোজ ইনজেকসান, রেক্টাম ফিডিং, কিছুতেই নয়। স্থির হ'ল অন্ত্রের মধ্যে অস্ত্রোপচার করে রবারের নলে খাবার দেওয়া। এ অস্ত্রোপচারে শরৎচন্দ্রই সাহস জোগালেন। অস্ত্রোপচার হ'ল। দেহে রক্ত নেই। শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গও অচলপ্রায়। রক্ত দেওয়া হল। না। ২রা মাঘ রবিবার বেলা দশটায় দীপ নিভে গেল। (পৃপৃঃ ১০৯-১১১)

সূর্যাস্ত

"কবির শরীর ক্রমশই মন্দের দিকে যাইতেছে," লিখেছেন রবীন্দ্রজীবনী-কার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। "কিন্তু চিঠিপত্র আসিলে বা ভালো বই পাইলে তাহার ঠিক মতো জবাব এখনো পাঠান।" ছবি নিয়ে লিখলেন শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় ও যামিনী রায়কে। অবনীন্দ্রনাথের "ঘরোয়া"র পাণ্ডু-লিপি পেয়ে লিখলেন। কিন্তু যেটি অন্যতম সর্বজনীন ঐতিহাসিক "খোলা চিঠি" তা লিখলেন বৃটিশ পার্লমেন্ট সদস্য মিস্‌ র‍্যাথবোনের "ভারতের প্রতি অপমানকর উক্তির" প্রতিবাদে। র‍্যাথবোনের চিঠিটি প্রধানত জওহরলালের বিরুদ্ধে। কবি বলেছেন, শাসকসম্প্রদায় যদি "স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই মহানুভব যোদ্ধার কণ্ঠ কারাপ্রাচীরের অন্তরালে রুদ্ধ না রাখিত, তাহা হইলে তিনি মিসের এই অযাচিত উপদেশের যথাযোগ্য ও সতেজ উত্তর দিতেন। বলপ্রয়োগ-জনিত তাঁহার মৌন আমাকেই, রোগশয্যা হইতেও, এই প্রতিবাদ জানাইতে বাধ্য করিয়াছে।"—·········

"যাহাই লিখুন বা বলুন শরীর আর বহিতেছে না।............ডাক্তারদের মত নিয়ে কবিরাজী চিকিৎসা শুরু হয়েছে।............"

"কিন্তু কোনো চিকিৎসায় কোনো উপকার দেখা যাইতেছে না। কলিকাতা হইতে ডাক্তার ইন্দুভূষণ বসু, বিধানচন্দ্র রায়, ললিত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়......আসিলেন। তাঁহারা কবিকে পরীক্ষাদি করিয়া স্থির করিলেন শ্রাবণ মাসে অপারেশন করিতে হইবে। ডাক্তার রামচন্দ্র অধিকারী, জিতেন্দ্রনাথ দত্ত এবং সত্যেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি বিশেষজ্ঞরাও কয়েকবার আসিলেন। অপারেশন সম্বন্ধে সকলেই একমত।

"অতঃপর ২৫ জুলাই (৯ শ্রাবণ) কবিকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হইল। তৎকালীন ই. আই. রেলওয়ের অধিকর্তা এন. সি. ঘোষ কবির জন্য বিশেষ একখানি সেলুন গাড়ির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন ॥

"জোড়াসাঁকোর পৈত্রিক বাড়িতে আসিলেন। এবার যেন বুঝিতেছেন আয়ু ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। দুই দিন পরে (১১ শ্রাবণ) লিখিলেন :

"প্রথম দিনের সূর্য প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—কে তুমি।
মেলেনি উত্তর
বৎসর বৎসর চলে গেল।
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগর তীরে।
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—কে তুমি।
পেলনা উত্তর।

"কয়েকদিন অপারেশনের পরামর্শাদির পর ৩০ জুলাই ডাক্তার ললিত মোহন বান্দ্যোপাধ্যায় অস্ত্রোপচার করিলেন।

"অপারেশনের কিছু পূর্বে কবি তাঁহার জীবন দেবতার উদ্দেশে শেষ অর্ঘ্য নিবেদন করিলেন :

"তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনা জালে
হে ছলনাময়ী।............
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

"অপারেশনের পর কয়েকদিনের মধ্যে শরীরের গতি সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল। অবশেষে রাখী পূর্ণিমার অবসানে ১৩৪৮ সালের ২২ শ্রাবণ (১৯৪১ আগষ্ট ৭) বেলা ১২-১০ মিনিটে কবির মহাপ্রয়াণ হইল। ৪৫

রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৮০।

আজ 'মৃত্যুহীন প্রাণ' দেশবন্ধু নেই, 'যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে' সেই শরৎচন্দ্র নেই, বাংলা সাহিত্যে, স্বদেশহিতৈষণায় ও বিশ্বমানবতায় যিনি সকলকে উত্তীর্ণ ক'রে গেছেন সেই রবীন্দ্রনাথ নেই। তাঁদের স্মৃতিরেখা, অনুরাগে লেখা রচনাবলী উত্তর পুরুষ ও উত্তর সাধকের হাতে সমর্পিত।

রবীন্দ্রনাথ 'বিচিত্রগামী', তিনি লিখেছেন কাব্য (রবীন্দ্র রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংস্করণ, তিন খণ্ড), গীতবিতান ও বিবিধ কবিতা (৪র্থ খণ্ড), আখ্যানকাব্য ও নাট্যকাব্য (৫ম খণ্ড), গদ্য নাটক (৬ষ্ঠ খণ্ড), গল্প (সপ্তম খণ্ড), উপন্যাস (৮ম ও ৯ম খণ্ড, মোট ১৪ খানি), প্রবন্ধ, (আত্মপরিচয়, বিশ্বযাত্রী) পত্রাবলী, চারিত্রপূজা, শিক্ষা, ধর্ম, স্বদেশ ও সমাজ ভাষা ও সাহিত্য, বিবিধপ্রসঙ্গ (১০ম, ১১শ, ১২শ, ১৩শ, ১৪শ খণ্ড) সম্পূরণ (১৫শ খণ্ড)

শরৎ-রবীন্দ্র-রচনাবলী

শরৎচন্দ্রের রচনাবলীও ১৩ খণ্ডে প্রকাশিত; উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধ মিশ্রিত। শরৎচন্দ্র বিচিত্রগামী নন। তাঁর কাব্য নেই, গীত নেই, আখ্যান কাব্য, নাট্যকাব্য নেই, তিনখানি নাটক উপন্যাসেরই রূপান্তর—যথা দেনা-পাওনা-ষোড়শী, পল্লী সমাজ-রমা, দত্তা-বিজয়া; যেমন রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষি-বিসর্জন, বৌঠাকুরাণীর হাট-প্রায়শ্চিত্ত মুক্তধারা ইত্যাদি এবং প্রজাপতির নির্বন্ধ-চিরকুমার সভা। রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র নাটক আছে, শরৎচন্দ্রের নেই। শরৎচন্দ্রের আছে উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, পত্রাবলী। সর্বসাকুল্যে শ'খানেক হবে। শরৎচন্দ্র প্রথম সতের বছর বয়সে কিছু লেখেন, তারপর দীর্ঘছেদ পড়ে। ১৯০৩-এ বর্মা যান। ১৯১৩ থেকে আবার লিখতে সুরু করেন। তারপর আর বিশেষ ছেদ পড়েনি। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস গল্পগুলো যেমন অবিচ্ছিন্ন টানে এবং সত্যিই একটা প্যাটার্ণে সুসম্বদ্ধ, প্রবন্ধগুলো তা নয়; প্রবন্ধগুলো বড্ড এলোমেলো। এবং শরৎচন্দ্র এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন।

---

(৪৫) রবীন্দ্র জীবনী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্টঃ ২৪৯-২৫৩

সংলাপ সম্পর্কে তাঁর যেমন আত্মবিশ্বাস ছিল, প্রবন্ধের শৈথিল্য তেমনি একাধিকবার স্বীকার করেছেন। পলেমিকসও বড় দুর্বল।

রবীন্দ্রনাথ বৃটিশ সরকারের দেওয়া নাইটহুড পেয়েছিলেন, জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তা বর্জন করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডক্টরেট পান। কিন্তু দেশের লোকে তাঁকে কবিগুরু আখ্যায়ই ভূষিত করত এবং এখনও করে। শরৎচন্দ্র কোন বৃটিশ স্বীকৃতি পান নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্মানিক ডক্টরেট পেয়েছেন। কিন্তু লোকে বলে 'অপরাজেয় কথাশিল্পী', বসুমতী সাহিত্য মন্দির বলেছিল 'বঙ্কিমচন্দ্রের শূণ্য সিংহাসনের অবিসম্বাদী সম্রাট—বৈচিত্রে যদিও তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সমকক্ষ নন। বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশী ভাবনায় 'আনন্দ মঠ' লিখেছেন—'বন্দেমাতরম' যেখানে প্রক্ষিপ্ত, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'চার অধ্যায়', শরৎচন্দ্র লিখেছেন 'পথের দাবী'—অস্থায়ী অনুপ্রেরণা ছাড়া কোনটিই উত্তর পুরুষ বা প্রাণদানী যুবশক্তিকে স্থায়ী আদর্শের পুষ্টি বা পথ নির্দেশ দিতে পারে নি—যে কারণে অঢেল রক্ত দিয়েও বাঙলার বিপ্লবীরা ব্যর্থ হয়ে গেছেন ; ভারতের স্বাধীনতা অবশ্যই এসেছে কৃপণ হস্তান্তরে ; কিন্তু বাঙলার স্বাধীনতা-স্বপ্ন সফল হয়নি ; সে স্বাধীনতার নীট ফল পেয়েছে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু, ভিখিরী ও সীমান্তের চোরাই চালানদার। উত্তরপুরুষ আদর্শের অভাবে তালকানা হয়ে কখনো রুশিয়ার অনুসৃতিতে নয়তো চীনের আনুগত্যে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চেয়েছে, একটা অবিচ্ছিন্ন স্বদেশী বিপ্লবী ভাবনার সৃষ্টি হয় নি।

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মতই গান গাইতে পারতেন ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত গীত রচনা করেন নি বা রবীন্দ্রনাথ যেমন ওস্তাদ সঙ্গীতকারের কাছে বিধিবদ্ধ প্রণালীতে তালিম পেয়েছেন, শরৎচন্দ্রের জীবনে তা ঘটেছে বলে কোথাও পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ নিপুণ মালীর সযত্ন লালিত সুস্থগাছের ফল, শরৎচন্দ্র আপনি বিকশিত বনফুল।

শরৎচন্দ্র সারাভারত ঘুরেছেন বলে দাবী করেছেন ; কিন্তু তাঁর রচনা বৈচিত্র্যে সে অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত নয় ; তিনি রবীন্দ্রনাথের মত বিদেশ যাত্রাও করেন নি। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথ কেবল বৃহত্তর ভারত বা প্রাচ্য দেশ নয়, য়ুরোপ আমেরিকা মহাদেশ, হ্যাঁ, সোভিয়েট রুশিয়াও পর্যাটন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র ক'রে বা ঘিরে যেমন একটা 'স্কুল' গড়ে উঠেছে, শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র ক'রে বা ঘিরে তেমন কোন 'স্কুল' গড়ে ওঠেনি। শরৎচন্দ্র

আপনাতে আপনি সীমাবদ্ধ। তবু তিনি পাঠকমহলে অতি আপন জন ও মহাবিস্ময়। রবীন্দ্রনাথ প্রধানত বেঁচে আছেন সঙ্গীতে, আবৃত্তি প্রতি-যোগিতায় নয়তো নৃত্যনাট্যে এবং তারই নাম অধুনা হয়েছে সংস্কৃতি—তাই থেকে সাংস্কৃতিক সম্মেলন; শরৎচন্দ্র বেঁচে আছেন প্রধানত উপন্যাসে, গল্পে। রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে বেতারে, স্কুলে, ঘরে ঘরে সরবে উচ্চারিত; শরৎচন্দ্র ঘরে একান্তে পাঠকের মনোরাজ্যে, অনুচ্চারিত অন্তরে। দু'জনেই কালোত্তীর্ণ দিক-নির্ণয়ী অনির্বাণ আলোস্তম্ভ।

পরিশিষ্ট

শরৎচন্দ্র যে চিঠিখানি লিখেও বন্ধুদের পরামর্শক্রমে পাঠাননি শ্রীউমা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে রক্ষিত সেই চিঠিটি শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ, ত্রয়োদশ সম্ভারের ৪৫৭-৪৫৯ পৃষ্ঠায় ছাপা আছে। চিঠিটি এই ঃ

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাওড়া

শ্রীচরণেষু,

আপনার পত্র পেলাম। বেশ, তাই হোক। বইখানা আমার নিজের বলে একটুখানি দুঃখ হবারই কথা, কিন্তু সে কিছুই নয়। আপনি যা কর্ত্তব্য এবং উচিত বিবেচনা করেছেন তার বিরুদ্ধে আমার অভিমানও নেই অভিযোগও নেই। কিন্তু আপনার চিঠির মধ্যে অন্যান্য কথা যা' আছে সে সম্বন্ধে আমার দুই একটা প্রশ্নও আছে, বক্তব্যও আছে। কৈফিয়তের মত যদি শোনায় সে শুধু আপনাকেই দিতে পারি।

আপনি লিখেছেন ইংরাজরাজের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। ওঠবারই কথা। কিন্তু এ যদি আমি অসত্য প্রচারের মধ্যে দিয়ে করবার চেষ্টা করতাম লেখক হিসেবে তাতে আমার লজ্জা ও অপরাধ দুইই। কিন্তু জ্ঞানতঃ তা আমি করিনি। করলে politicianদের propaganda হ'ত কিন্তু বই হ'ত না। নানা কারণে বাঙলা ভাষায় এ ধরণের বই কেউ লেখে না। আমি যখন লিখি এবং ছাপাই তার সমস্ত ফলাফল জেনেই করেছিলাম। সামান্য সামান্য অজুহাতে ভারতের সর্ব্বত্রই যখন বিনা বিচারে অথবা বিচারের ভান করে কয়েদ নির্বাসন প্রভৃতি লেগেই আছে তখন আমি যে অব্যাহতি পাবো, অর্থাৎ, রাজপুরুষেরা আমাকেই ক্ষমা করে চলবেন এ দুরাশা আমার ছিল না। আজও নেই। তাঁদের হাতে সময়ের টানাটানি নেই, সুতরাং, দুদিন আগে পাছের জন্য কিছুই যায় আসে না। এ আমি জানি, এবং জানার হেতুও আছে। কিন্তু এ যাক। এ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু বাঙলা দেশের গ্রন্থকার হিসেবে গ্রন্থের মধ্যে যদি মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে থাকি, এবং তৎসত্ত্বেও যদি রাজরোষে শাস্তি ভোগ করতে হয় ত করতেই হবে—তা' মুখ বুজেই করি বা অশ্রুপাত করেই করি, কিন্তু প্রতিবাদ করা কি প্রয়োজন নয়? প্রতিবাদেরও দণ্ড আছে, এবং মনে করি, তারও পুনরায় প্রতিবাদ

হওয়া আবশ্যক। নইলে, গায়ের জোরকেই প্রকারান্তরে ন্যায্য বলে স্বীকার করা হয়। এই জন্যেই প্রতিবাদ চেয়েছিলাম। শাস্তির কথাও ভাবিনি এবং প্রতিবাদের জোরেই যে এ-বই আবার ছাপা হবে এ সম্ভাবনার কল্পনাও করিনি।

চুরি ডাকাতির অপরাধে যদি জেল হয় তার জন্যে হাইকোর্টে আপিল করা চলে, কিন্তু আবেদন যদি অগ্রাহ্যই হয়, তখন দু-বছর না হয়ে তিন বছর হল কেন এ নিয়ে বিলাপ করা সাজে না। রাজবন্দীরা জেলের মধ্যে দুধ ছানা মাখন পায় না ব'লে কিংবা, মুসলমান কয়েদীরা মোহরমের তাজিয়ার পয়সা পাচ্ছে, আমরা দুর্গোৎসবের খরচ পাইনা কেন এই ব'লে চিঠি লিখে কাগজে কাগজে রোদন করায় আমি লজ্জা বোধ করি, কিন্তু মোটা ভাতের বদলে যদি Jail authorityরা ঘাসের ব্যবস্থা করে, তখন হয়ত তাদের লাঠির চোটে তা চিবোতে পারি, কিন্তু ঘাসের ড্যালা কণ্ঠরোধ না করা পর্য্যন্ত অন্যায় বলে প্রতিবাদ করাও আমি কর্তব্য মনে করি।

কিন্তু বইখানা আমার একার লেখা, সুতরাং দায়িত্বও একার। যা বলা উচিত মনে করি, তা বলতে পেরেছি কিনা এইটেই আসল কথা। নইলে ইংরাজ সরকারের ক্ষমতাশীলতার প্রতি আমার কোন নির্ভরতা ছিল না। আমার সমস্ত সাহিত্য সেবাটাই এই ধরণের। যা উচিত মনে করেছি তাই লিখে গেছি।

আপনি লিখেছেন আমাদের দেশের রাজারা এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অন্যান্য রাজশক্তির কারও ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের মত সহিষ্ণুতা নেই। একথা অস্বীকার করবার অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিন্তু এ আমার প্রশ্নই নয়। আমার প্রশ্ন ইংরাজ রাজশক্তির এ বই বাজেয়াপ্ত করবার justification যদি থাকে, পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে protest করার justificationও তেমনি আছে।

আমার প্রতি আপনি এই অবিচার করেছেন যে, আমি যেন শাস্তি এড়াবার ভয়েই প্রতিবাদের ঝড় তুলতে চেয়েছি এবং সেই ফাঁকে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করেচি। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। দেশের লোকে যদি প্রতিবাদ না করে আমাকে করতেই হবে। কিন্তু সে হৈ-চৈ করে নয়, আর একখান বই লিখে।

আপনি নিজে বহুদিন যাবৎ দেশের কাজে লিপ্ত আছেন, দেশের

বাহিরের অভিজ্ঞতাও আপনার অত্যন্ত বেশি, আপনি যদি শুধু আমাকে এই আদেশ দিতেন যে এই বই প্রচারে দেশের সত্যকার মঙ্গল নেই, সেই আমার সান্ত্বনা হোতো। মানুষের ভুল হয়, আমারও ভুল হয়েছে মনে করতাম।

আমি কোন রূপ বিরুদ্ধ ভাব নিয়ে এ-চিঠি আপনাকে লিখিনি, যা মনে এসেছে তাই অকপটে আপনাকে জানালাম। মনের মধ্যে যদি কোন ময়লা আমার থাকতো আমি চুপ করেই যেতাম! আমি সত্যকার রাস্তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি, তাই সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে নির্ব্বাসনে বসে আছি। অর্থে সামর্থে সময়ে কত যে গেছে সে কাউকে জানাবার নয়। দিনও ফুরিয়ে এলো, এখন সত্যিকার কিছু একটা করবার ভারি ইচ্ছে হয়।

উত্তেজনা অথবা অজ্ঞতাবশতঃ এ পত্রের ভাষা যদি কোথাও রূঢ় হয়ে থাকে আমাকে মার্জ্জনা করবেন। আপনার অনেক ভক্তের মাঝে আমিও একজন, সুতরাং কথায় বা আচরণে আপনাকে লেশমাত্র ব্যথা দেবার কথা আমি ভাবতে পারিনে। ইতি ২রা ফাল্গুণ, ১৩৩৩।

সেবক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নির্দেশিকা